অধ্যায় ১১ জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
Genetics & Evolution

বংশবিস্তারের মাধ্যমে জীবের বংশধারা অক্ষুন্ন থাকে। পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জীব তার নিজের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণসম্পন্ন অপত্য জীবের জন্ম দেয়; তাই কুকুরের শাবক কুকুরের মতো, গরুর শাবক গরুর মতোই হয়। এক প্রজন্ম (generation) থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে **বংশগতি** (heredity) বলে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অসম্পূর্ণ প্রকটতা
- লিথাল জিন
- এপিস্ট্যাসিস
- হিমোফিলিয়া
- Rh ফ্যাক্টর
- বিবর্তনের মতবাদ
- পুনরাবৃত্তি মতবাদ
- সমসংস্থ অঙ্গ
- সমবৃত্তি অঙ্গ
- আর্কিওপটেরিক্স

বংশগতির ধারাবাহিক পরিক্রমার সময় বিভিন্ন কারণে জীবদেহে কিছু আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে। কালক্রমে এ পরিবর্তনগুলো ঐ জীবের জিনগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতি। এ জন্যে প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালব্যাপী অতিমন্থর গতির বিবর্তন। এ অধ্যায়ে জীবের **বংশগতি** এবং **বিবর্তন** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি	পাঠ ১	মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স
❐ ইনহেরিট্যান্সের ক্রোমোজোম তত্ত্ব	পাঠ ২	মেন্ডেলের সূত্রসমূহ
❐ মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ	পাঠ ৩	ইনহেরিট্যান্স এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব
❐ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স	পাঠ ৪	মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম
❐ লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ	পাঠ ৫	মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম
❐ সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার এর কারণ	পাঠ ৬	পলিজেনিক বা বহুজিনীয় ইনহেরিট্যান্স
❐ রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ	পাঠ ৭	লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY, XX-XO) নীতি
❐ বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা	পাঠ ৮	সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার: বর্ণান্ধতা
❐ বিবর্তনের মতবাদসমূহ	পাঠ ৯	হিমোফিলিয়া ও মাসকুলার ডিস্ট্রফি
❐ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ	পাঠ ১০	ABO ব্লাডগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা
❐ প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান	পাঠ ১১	বিবর্তন তত্ত্ব: ল্যামার্কিজম
	পাঠ ১২	বিবর্তন তত্ত্ব: ডারউইনিজম
	পাঠ ১৩	বিবর্তনের প্রমাণাদি: জীবাশ্ম ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ
	পাঠ ১৪	বিবর্তনের প্রমাণাদি: শ্রেণিবিন্যাসগত, জীবভৌগোলিক বিস্তারজনিত ও অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ
	পাঠ ১৫	বিবর্তনের প্রমাণাদি: ভ্রূণতাত্ত্বিক, শারীরবৃত্তীয়, জীব রসায়নঘটিত, কোষতাত্ত্বিক ও জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ

১১.১ : জিনতত্ত্ব (Genetics)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কাজ, বংশপরম্পরায় সঞ্চারণের ধরণ ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে বংশগতিবিদ্যা বা **জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স** (Genetics) বলে। উইলিয়াম বেটসন (William Bateson, 1861—1926) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Genetics শব্দ প্রচলন করেন। Genetics শব্দটি গ্রিক শব্দের মূল রূপ 'gen' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার প্রকৃত অর্থ হলো পরিণতি স্বরূপ ঘটা (to become) অথবা কোনো কিছুতে উদ্ভূত হওয়া (to grow into)।

CamScanner

জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

মানবকল্যাণে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর শাখা হলো **জিনতত্ত্ব**। জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ কয়েকটি দিক নিম্নরূপ :

- জিনের প্রয়োজনীয় গাঠনিক ও পরিমাণগত (পলিপ্লয়ডি) পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও বাড়তি পুষ্টিমানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জাতের ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নতজাতের গৃহপালিত পশু-পাখি উদ্ভাবন অব্যাহত আছে।
- ত্রুটিপূর্ণ জিন অপসারণ ও উপযুক্ত জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে মানানসই, সুস্থ, দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।
- বংশগতির ধারা পর্যালোচনা করে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংকরায়নের মাধ্যমে মানুষসহ অন্যান্য প্রজাতির উৎকর্ষতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে।
- মানুষের বিভিন্ন রোগের (যেমন, ক্যান্সার) জেনেটিক কারণ উদঘাটন ও নিরাময় সম্পর্কে মানুষ অত্যন্ত আশাবাদী।
- অণুজীবের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এগুলোর সংক্রমণ ক্ষমতা রহিত করা হচ্ছে।
- অপরাধী শনাক্তকরণে, পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্বের সম্পর্ক যাচাইয়ে জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- শ্রেণিবিন্যাসকরণে প্রাণিদের বিভিন্ন ট্যাক্সনে স্থাপন করতে ও জ্ঞাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জিনতত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল–আধুনিক জিনতত্ত্বের জনক
(Gregor Johann Mendel – Father of Modern Genetics)

মেন্ডেল কে ছিলেন ? আধুনিক জিনতত্ত্বের জনক বলে পরিচিত গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২–১৮৮৪) অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মযাজক ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর বিভিন্ন মটরশুঁটি (Pea) গাছের উপর নানান পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি বংশগতির দুটি "সূত্র" প্রবর্তন করেন। তাঁর সূত্রগুলোকে **মেন্ডেলের সূত্র** বা **মেন্ডেলিজম** (Mendelism) বলে আখ্যায়িত করা হয়। মেন্ডেল প্রদত্ত তত্ত্ব বর্তমান জিনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

মেন্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী : কৃষকের সন্তান **জোহান মেন্ডেল**-এর জন্ম ১৮২২ সালে অস্ট্রিয়ায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাঁর সমস্ত আশা–আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করে তিনি অস্ট্রিয়ার ব্রুন (Brunn) শহরে অবস্থিত গির্জায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেন।

১৮৫৭ সালে মেন্ডেল ৩৪ প্রকার **মটরশুঁটি** *(Pisum sativum)* সংগ্রহ করে গির্জা সংলগ্ন বাগানে উদ্ভিদের বংশগতি রহস্য উদঘাটনের জন্য পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছরের কঠিন ও শ্রমসাধ্য পরীক্ষা শেষে তিনি বংশগতির দুটি সূত্র (Law) আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষার সমস্ত কাগজপত্র ১৮৬৬ সালে **ব্রুন ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি** (Natural History Society of Brunn)-তে জমা দেন। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এ পরীক্ষার গুরুত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। **১৮৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারি,** তাঁর সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা লাভের অনেক আগেই, মেন্ডেল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিন ভিন্ন দেশের তিন বিজ্ঞানী পৃথকভাবে কিন্তু একই সময়ে মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেন।

Gregor Johann Mendel

CamScanner

বিজ্ঞানীরা হলেন :

১. নেদারল্যান্ডসের উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হিউগো ডে ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1848–1935),
২. জার্মানির উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক **কার্ল করেন্স** (Carl Correns, 1864–1933) এবং
৩. অস্ট্রিয়ার কৃষিবিজ্ঞানী **এরিক শের্মেক** (Erich Tschermak, 1871–1962) ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো এ বিজ্ঞানীরা তাঁদের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেই মেন্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এভাবে মেন্ডেলের গবেষণার মাধ্যমে বংশগতির মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার ও প্রকাশের মাধ্যমে যে ভিত্তি রচিত হয় তার উপর নির্ভর করে জীববিজ্ঞানে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার বিকাশ ঘটে। এ কারণে মেন্ডেলকে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্বের জনক** (Father of Genetics) বলে অভিহিত করা হয়।

মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

মেন্ডেল **বিপরীত বৈশিষ্ট্য** (alternative character)-যুক্ত দুধরনের মটরশুঁটি গাছ (*Pisum sativum*) নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এক ধরনের উদ্ভিদ ছিল **লম্বা** (tall), অন্য শ্রেণির উদ্ভিদ ছিল **খাটো** (dwarf)। পরীক্ষা শুরুর আগে তিনি মটরশুঁটি গাছের বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) একটি **লম্বা** উদ্ভিদের সঙ্গে শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত একটি **খাটো** উদ্ভিদের কৃত্রিম পরাগসংযোগ ঘটান। লম্বা উদ্ভিদের **পরাগরেণু** (pollen) নিয়ে খাটো উদ্ভিদের উদ্ভিদের গর্ভমুন্ডে স্থাপন করা হয়। পরাগসংযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে যে সব উদ্ভিদ আবির্ভূত হয় তার **সবই লম্বা**। প্রথম পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলোকে মেন্ডেল **প্রথম বংশধর** (first filial generation) বা F_1 জনুরূপে চিহ্নিত করেন। পরে মেন্ডেল F_1 জনুর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে সংকরায়ন (hybridization) ঘটান। দ্বিতীয়বার পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট **দ্বিতীয় বংশধর** (second filial generation)-এ বা F_2 **জনু**-র মোট ১০৬৪ উদ্ভিদের মধ্যে ৭৮৭টি লম্বা এবং ২৭৭টি খাটো পাওয়া গেল, অর্থাৎ লম্বা ও খাটো উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়ালো ৩ : ১। এভাবে মেন্ডেল মটরশুঁটি গাছের নির্বাচিত **সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য** (প্রকট ও প্রচ্ছন্ন) নিয়ে সংকরায়ন ঘটান।

চিত্র ১১.১.১ : মেন্ডেল যেভাবে সংকরায়ন ঘটান

মেন্ডেলের উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো (প্রতিক্ষেত্রে) একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং এ ধরনের পরীক্ষাকে **মনোহাইব্রিড ক্রস** (monohybrid cross) বা **একলক্ষণ সংকরায়ন** বলে।

বীজ		ফুল	খোসা		কান্ড	
আকার	বীজপত্র	বর্ণ	আকার	বর্ণ	কান্ডে ফুলের অবস্থান	দৈর্ঘ্য
		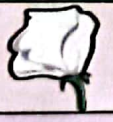		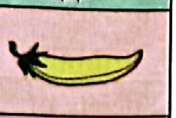		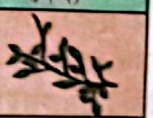
গোল	হলুদ	সাদা	মসৃণ	হলুদ	কাক্ষিক	লম্বা
				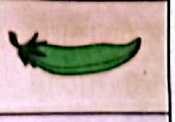		
কুঞ্চিত	সবুজ	বেগুনী	খাঁজযুক্ত	সবুজ	শীর্ষ	খাটো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

চিত্র ১১.১.২ : মেন্ডেল মটরশুঁটির উপরোক্ত ৭ জোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা চালান

পরবর্তীতে মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের সাথে অপর একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **সবুজ-কুঞ্চিত বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের পরাগসংযোগ ঘটানোর পর দেখা গেল F_1 জনুর সবগুলো উদ্ভিদই **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু F_2

CamScanner

জনুতে ১৬টি বংশধরের মধ্যে ৯টি হলুদ-গোল, ৩টি হলুদ-কুঞ্চিত, ৩টি সবুজ-গোল ও ১টি সবুজ-কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদ পাওয়া গেল। মেন্ডেলের এ পরীক্ষাকে (দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংঘটিত) **ডাইহাইব্রিড ক্রস** (dihybrid cross) বা **দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন** বলে। মেন্ডেলের গবেষণা ও ফলাফল সামগ্রিকভাবে **মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স** নামে পরিচিত।

পরীক্ষার জন্য মেন্ডেলের মটরগাছ বেছে নেয়ার কারণ

বাগানের মটরগাছে (garden pea, *Pisum sativum*) নিম্নোক্ত কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার জন্য মটরগাছকে নমুনা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

১. মটরগাছ **একবর্ষজীবী** হওয়ায় খুবই সহজেই বাগানের জমিতে ও টবে ফলানো যায়।

২. মটরগাছের প্রতিটি জনুর **আয়ুষ্কাল অল্প** হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যেই সংকরায়ন পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

৩. মটরফুল **উভলিঙ্গ** হওয়ায় সহজেই স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

৪. মটরফুল **স্ব-পরাগী** হওয়ায় বাইরে থেকে আসা অন্য কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজে মিশে যেতে পারে না, ফলে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শুদ্ধ সন্তান-সন্ততি উৎপাদন সম্ভব।

৫. ফুলগুলো আকারে বড় হওয়ায় মটর গাছে খুব সহজেই পরপরাগায়নও ঘটানো সম্ভব হয়।

৬. মটরগাছে সুস্পষ্ট তুলনামূলক বংশগতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়–এ জন্য মটর গাছের **বহু প্রকরণ** (varieties) উপস্থিত।

চিত্র ১১.১.৩ : বাগানের মটরগাছ

৭. সংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বংশধরগুলো **উর্বর** (fertile) হয়; অর্থাৎ এগুলো জননক্ষম হওয়ায় নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

মেন্ডেলের সাফল্যের বা কৃতকার্য হওয়ার কারণ (Reasons Behind Mendel's Success)

মেন্ডেলের আগেও অনেক বিজ্ঞানী সংকরায়ন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মেন্ডেলই প্রথম এ ধরনের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে কতকগুলো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূল কারণগুলো হচ্ছে–

১. তিনি মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এ গাছ স্বপরাগী। ফুলের বিশেষ গঠনের জন্য বিপরীত পরাগায়নের সম্ভাবনা কম থাকায় পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

২. তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সব উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো খাঁটি (pure) অর্থাৎ হোমোজাইগাস ছিল।

৩. তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতিজোড়া জিনের একটি জিন অন্য জিনের উপর সম্পূর্ণ প্রকট (dominant) ছিল।

৪. মটরশুঁটির ডিপ্লয়েড কোষে সাতজোড়া ক্রোমোজোম আছে।

৫. মেন্ডেল যে সাতজোড়া চরিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত বলে কোন লিংকেজ (linkage) সংক্রান্ত ঝামেলা ঘটেনি।

৬. কোন লিংকড চরিত্রের সম্মুখীন হলে মেন্ডেল হয়তোবা দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দানে ব্যর্থ হতেন। কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মেন্ডেলের নির্ধারিত সাতজোড়া চরিত্রের মধ্যে কোনটাই লিংকড চরিত্র ছিলনা।

৭. সংকরায়ন করার আগে তিনি বারবার উদ্ভিদগুলোর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেছেন।

৮. কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তিনি কয়েক বংশধরে উদ্ভিদগুলোর প্রজনন ঘটিয়েছেন।

৯. মেন্ডেল অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১০. গাণিতিক পদ্ধতিতে মেন্ডেল তাঁর ফলাফলের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

(Linkage : একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত সংযুক্ত বা লিংকড জিনগুলোর একই সাথে থাকা অর্থাৎ মিয়োসিসের সময় একই গ্যামেটে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতা)।

CamScanner

জিনতত্ত্বে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ব্যাখ্যা

জিনতত্ত্ব সহজভাবে বুঝতে হলে নিম্নোক্ত শব্দগুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

১. ফ্যাক্টর (Factor) বা জিন (Gene) : জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের একককে জিন বলে। অর্থাৎ জিন হচ্ছে বংশগতির ধারক ও বাহক। মূলত ক্রোমোজোমে অবস্থিত যে কোনো কার্যকরি একক যাতে রিকম্বিনেশন সম্ভব এবং যা মিউটেশনে অংশ নিতে পারে তা-ই জিন। আধুনিক ধারণা মতে, DNA-র যে বিশেষ বিশেষ অংশ তথা বেস-অনুক্রম কমপক্ষে একটি পলিপেপটাইড উৎপাদনের কোড বা সংকেত ধারণ করে, তাকে জিন বলে।

২. লোকাস (Locus) : ক্রোমোজোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থান-এর নাম লোকাস। একটি নির্দিষ্ট জিনের অ্যালিলগুলো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থান করে।

৩. অ্যালিল বা অ্যালিলোমরফ (Allele or Allelomorph) : সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ার একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে। অ্যালিলদুটি একই ধর্মী (যেমন—TT) অথবা একে অপরের বিপরীত ধর্মী (যেমন—Tt) হতে পারে। যখন দুটি বিপরীতধর্মী অ্যালিল থাকে তখন একটিকে প্রকট অ্যালিল (অর্থাৎ T), অন্যটিকে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (t) বলে।

৪. হোমোজাইগাস (Homozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন-BB = কালো পশম, bb = বাদামী পশম ইত্যাদি।

৫. হেটারোজাইগাস (Heterozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে হেটারোজাইগাস জীব বলে। যেমন T এবং t অর্থাৎ Tt-ধারী জীবটি লম্বা হলেও তা হেটারোজাইগাস।

৬. প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) : একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হোমোজাইগাস জীবে (TT এবং tt) সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের লক্ষণের জন্যে একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকট।

৭. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) : হেটারোজাইগাস জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপাদান একত্রে থাকলেও একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে। জীবের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন।

৮. জিনোটাইপ (Genotype) : কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা যায়। সদৃশ জিনোটাইপধারী জীবেরা যদি একই পরিবেশে বাস করে তাহলে ওদের ফিনোটাইপও সদৃশ হবে। একটি লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে TT বা Tt আর খাটো গাছের জিনোটাইপ হবে tt।

৯. ফিনোটাইপ (Phenotype) : জিনোটাইপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। এটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে। সদৃশ ফিনোটাইপধারী দুটি জীবের জিনোটাইপ একই রকম বা ভিন্ন হতে পারে। যেমন–বিশুদ্ধ লক্ষণযুক্ত লম্বা ও খাটো মটর গাছের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটালে F_1 জনুতে সবগুলো উদ্ভিদই লম্বা আকৃতির হয় যদিও এদের মধ্যে দুধরনের ফ্যাক্টরই (Tt) থাকে। এখানে ফিনোটাইপ হলো লম্বা।

১০. প্যারেন্টাল জেনারেশন ও অপত্য বংশ (Parental generation & Filial generation) : কোন ক্রসে ব্যবহৃত পিতা-মাতাকে "প্যারেন্টাল জেনারেশন" বা P_1 এবং উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে প্রথম অপত্য বংশ বা F_1 জনু বলে। আবার F_1 সন্তান-সন্ততির মধ্যে ক্রস করলে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে দ্বিতীয় অপত্য বংশ বা F_2 জনু বলে।

১১. একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) : জীবের একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন বা ক্রস ঘটানো হয়, তাকে একসংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন–কালো ও বাদামী বর্ণের গিনিপিগের মধ্যে ক্রস। মনোহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত সাধারণত ৩ : ১ হয়। মেন্ডেল তাঁর প্রথম সূত্রটি একসংকর ক্রসের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করেছিলেন।

CamScanner

১২. দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) : জীবের দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে সংকরায়ন বা ক্রস। যেমন: কালোবর্ণ–ছোটলোমধারী ও বাদামীবর্ণ–লম্বালোমযুক্ত গিনিপিগের ক্রস। ডাইহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) জিনের স্বাধীন সঞ্চারণের ফলে সাধারণত ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে চার ধরনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সন্ততি পাওয়া যায়।

১৩. টেস্ট ক্রস (Test cross) : F_1 বা F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবের সাথে সংকরায়ন বা ক্রস। এভাবে এদের F_1 এবং F_2 জনুর জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন–সংকর লম্বা মটরগাছ (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মটরগাছ (tt) এর সংকরায়ন ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক অনুপাত হবে ১ : ১।

১৪. ব্যাক ক্রস (Back cross) : F_1 জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়ন।

১৫. জিনোম (Genome) : জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টি।

মেন্ডেল-এর সূত্র (Mendel's Law)

প্রকৃতপক্ষে মেন্ডেল নিজে কোনো মতবাদ বা সূত্র প্রবর্তন করেননি। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে সংকরায়ন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের তত্ত্বীয় ও পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে **কার্ল করেন্স** (যিনি ১৯০০ সালে মেন্ডেলের অনুরূপ গবেষণা–ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন) মেন্ডেলের আবিষ্কারকে বংশগতির মৌলিক দুটি সূত্র হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য বলে প্রচার করেন। যেহেতু সূত্রদুটি মেন্ডেলের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত, তাই সূত্রদুটিকে **মেন্ডেল-এর সূত্র** নামে অভিহিত করা হয়। নিচে মেন্ডেল–এর সূত্রদুটি উল্লেখ করা হলো।

১. প্রথম সূত্র : সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্টের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জননকোষ (গ্যামেট) সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করে।

এ সূত্রকে **মনোহাইব্রিড ক্রস সূত্র** (Law of Monohybrid Cross) বা **জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র** (Law of Purity of Gametes) বা **পৃথকীকরণ সূত্র** (Law of Segregation)–ও বলা হয়।

২. দ্বিতীয় সূত্র : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম সংকর পুরুষে (F_1) কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ (গ্যামেট) উৎপাদনকালে বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করবে।

এ সূত্রকে **স্বাধীনভাবে মিলনের বা বণ্টনের সূত্র** (Law of Independent Assortment)–ও বলা হয়। এ ধরনের ক্রসে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের উৎপত্তি হয়।

প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা — মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid Cross)

প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য মেণ্ডেল **মটরশুঁটি** উদ্ভিদের উপর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এসব পরীক্ষায় তিনি এক সঙ্গে মাত্র একজোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটান। **একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে মনোহাইব্রিড ক্রস বলা হয়।**

মেণ্ডেলের এ ধরনের এক পরীক্ষায় শুদ্ধ **লক্ষণযুক্ত** (হোমোজাইগাস) একটি **লম্বা** (tall) মটর গাছের সাথে শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত অপর একটি **খাটো** (dwarf) মটর গাছের পরাগসংযোগ ঘটান। নিচে এর ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

ধরা যাক, মটর গাছের–

১. লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য **ফ্যাক্টর** বা জিন = T (বড় অক্ষরের)
২. খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য ফ্যাক্টর = t (ছোট অক্ষরের)
৩. প্রথম সংকর পুরুষ বা প্রথম বংশধর = F_1 জনু এবং
৪. দ্বিতীয় সংকর পুরুষ বা দ্বিতীয় বংশধর = F_2 জনু।

CamScanner

মেণ্ডেলের মতে, প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট, তাই–

লম্বা গাছের জিনোটাইপ = TT এবং খাটো গাছের জিনোটাইপ = tt

জননকোষ সৃষ্টির সময় ফ্যাক্টরগুলি পৃথক হয়ে যায়, অতএব লম্বা গাছের জননকোষে ফ্যাক্টর "T" এবং খাটো গাছের জননকোষে ফ্যাক্টর "t" প্রবেশ করবে। প্রথম সংকর পুরুষ বা F_1 জনুতে রেণু ও ডিম্বকের মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট বংশধরদের (Tt) সকলেই লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। এখানে "T" ফ্যাক্টরটি প্রকট এবং "t" ফ্যাক্টরটি প্রচ্ছন্ন।

অতঃপর F_1 জনুর বংশধরদের মধ্যে সংকরায়ন ঘটানো হলো। যেহেতু এরা দুধরনের ফ্যাক্টরই (Tt) বহন করে তাই জননকোষ (গ্যামেট) সৃষ্টির সময় অর্ধেক জননকোষে "T" এবং অর্ধেক কোষে "t" ফ্যাক্টর প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় সংকর পুরুষে বা F_2 জনুতে ৩টি লম্বা ও ১টি খাটো মটর গাছ উৎপন্ন হবে। অতএব ফিনোটাইপ অর্থাৎ বহিরাকৃতিগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করলে F_2 জনুতে উৎপন্ন গাছের অনুপাত দাঁড়ায় ৩ : ১।

F_2 জনুতে সৃষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের জিনোটাইপিক অনুপাত – TT : Tt : tt = ১ : ২ : ১

ফলাফলে দেখা যায় যে, সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য দুটি মিশ্রিত না হয়ে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন পৃথক পৃথক গ্যামেটে গমন করে। যেহেতু প্রতিটি গ্যামেট কেবল কোনো বৈশিষ্ট্যের একটি অ্যালিল (ফ্যাক্টর) গ্রহণ করে সেহেতু এটি বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয়। এজন্য একে **বিশুদ্ধ গ্যামেট** এবং সূত্রটিকে **জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র** বলে।

মটরশুটি গাছ নিয়ে মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রের গবেষণার ফলাফল

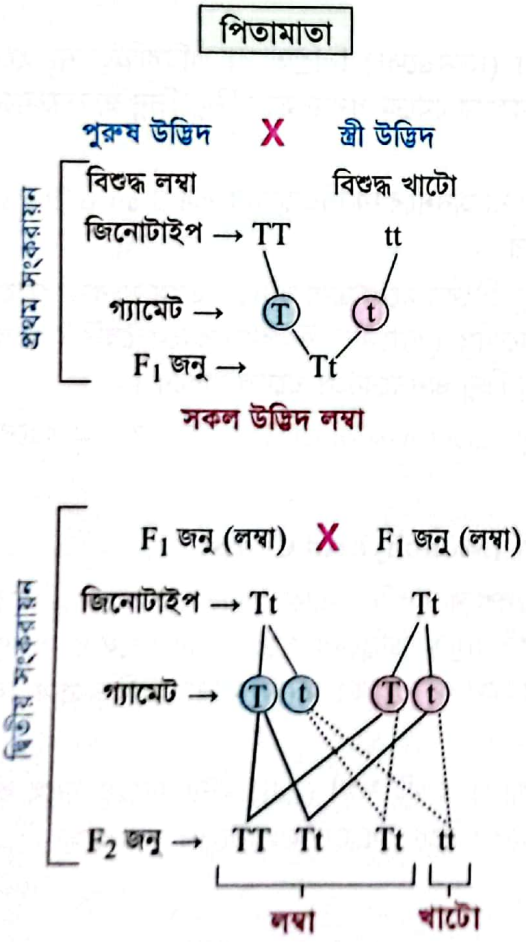

চিত্র ১১.১.৪. ক : মেণ্ডেলের প্রথম সূত্র

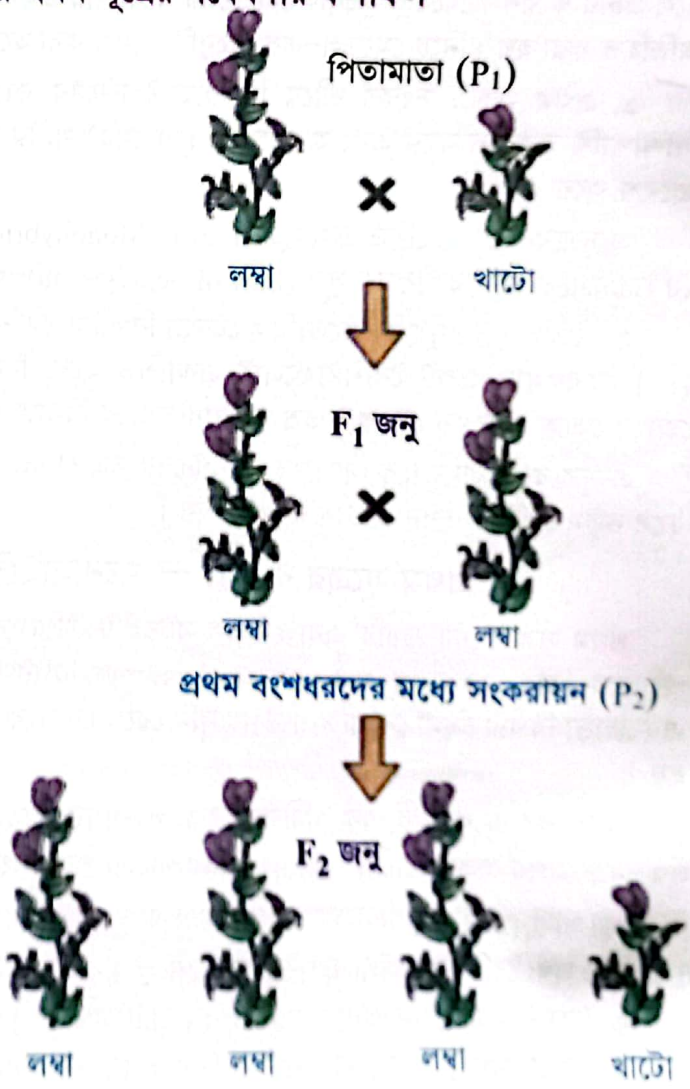

চিত্র ১১.১.৪.খ : ছবির মাধ্যমে মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা

CamScanner

প্রাণীর বংশগতিতে মেন্ডেলের প্রথম সূত্র অনুসরণ

সূত্র : সংকর (hybrid) জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

গিনিপিগে **কালো** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে B এবং **বাদামী** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে b প্রতীকে চিহ্নিত করলে বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **BB** এবং বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **bb**.

একটি হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ **কালো** (BB) বর্ণের স্ত্রী গিনিপিগের সাথে অপর একটি বিশুদ্ধ **বাদামী** (bb) বর্ণের পুরুষ গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সকল অপত্য গিনিপিগের বর্ণই হবে **কালো** (Bb) কারণ, কালো বর্ণের অ্যালিল (B) বাদামী বর্ণের অ্যালিল (b)-এর উপর প্রকট গুণসম্পন্ন। উভয় জিন দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকলেও বিনষ্ট বা একীভূত হয়ে যায় না বরং স্বকীয়তা বজায় রেখে অক্ষুন্ন থাকে।

F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৩টি কালো এবং ১টি বাদামী বর্ণের গিনিপিগের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিত্তিতে F_2 জনুতে গিনিপিগের কালো ও বাদামী বর্ণের অনুপাত হয় যথাক্রমে ৩ : ১।

F_2 জনুর সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী (কালো) গিনিপিগের মধ্যে মাত্র ১টি হোমোজাইগাস (BB), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস (Bb)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি (বাদামী) F_1 জনুতে অবদমিত ছিল, F_2 জনুতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে (bb)। অনুরূপভাবে, যে শুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্ট্য (BB) F_1 জনুতে অনুপস্থিত ছিল, সেটিও F_2 জনুতে ফিরে এসেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে প্রথম জনুতে B ও b একসঙ্গে থাকলেও পরস্পরের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়নি বরং **গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে গেছে**। নিচের ছকে ফলাফল দেখানো হলো।

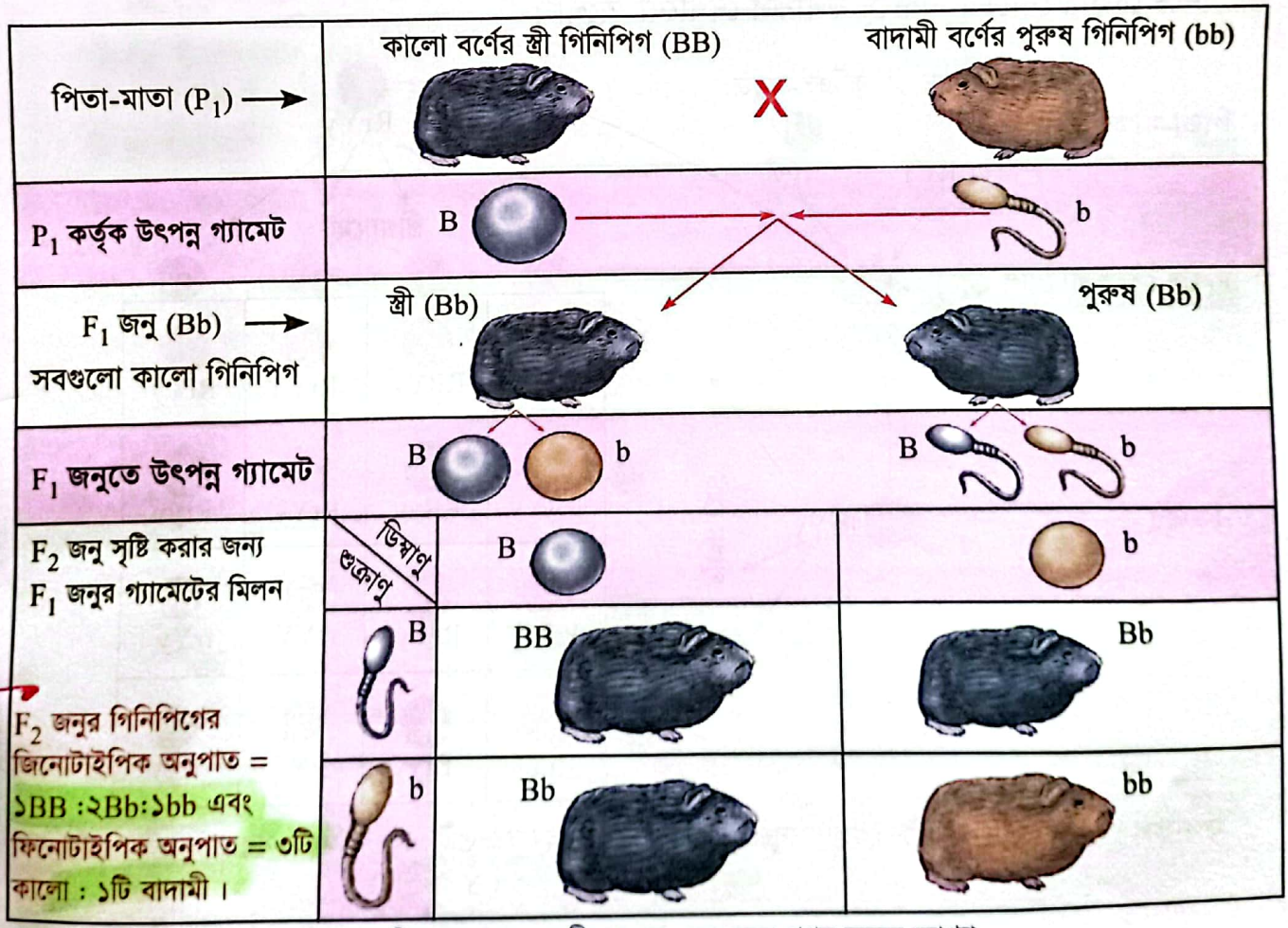

চিত্র ১১.১.৪ : প্রাণীর ক্ষেত্রে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা

CamScanner

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

সূত্র : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে (F_1) কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করবে।

অন্যভাবে বলা যায়– একটি জীবের দুই বা ততোধিক জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) গ্যামেট সৃষ্টির সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়। এ ব্যাপারে একজোড়া অন্যজোড়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

এ সূত্র প্রমাণের জন্য মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটান। দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটানো হয় তাকে দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (dihybrid cross) বলে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

এমন দুটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) মটরশুঁটি গাছ (*Pisum sativum*) নেয়া হলো যার একটি গোল ও হলুদ বর্ণের বীজ এবং অন্যটি কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

ধরা যাক, বীজের গোল লক্ষণের প্রতীক **R**, কুঞ্চিত লক্ষণের প্রতীক **r**; হলুদ লক্ষণের প্রতীক **Y** (বড় অক্ষরের), সবুজ লক্ষণের প্রতীক **y** (ছোট অক্ষরের); প্রথম বংশধর F_1 জনু এবং দ্বিতীয় বংশধর F_2 জনু।

মেন্ডেল-এর মতে, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে ফ্যাক্টর (জিন) দায়ী। অতএব, গোল ও হলুদ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে RRYY এবং কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে **rryy**.

নিচে চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো।

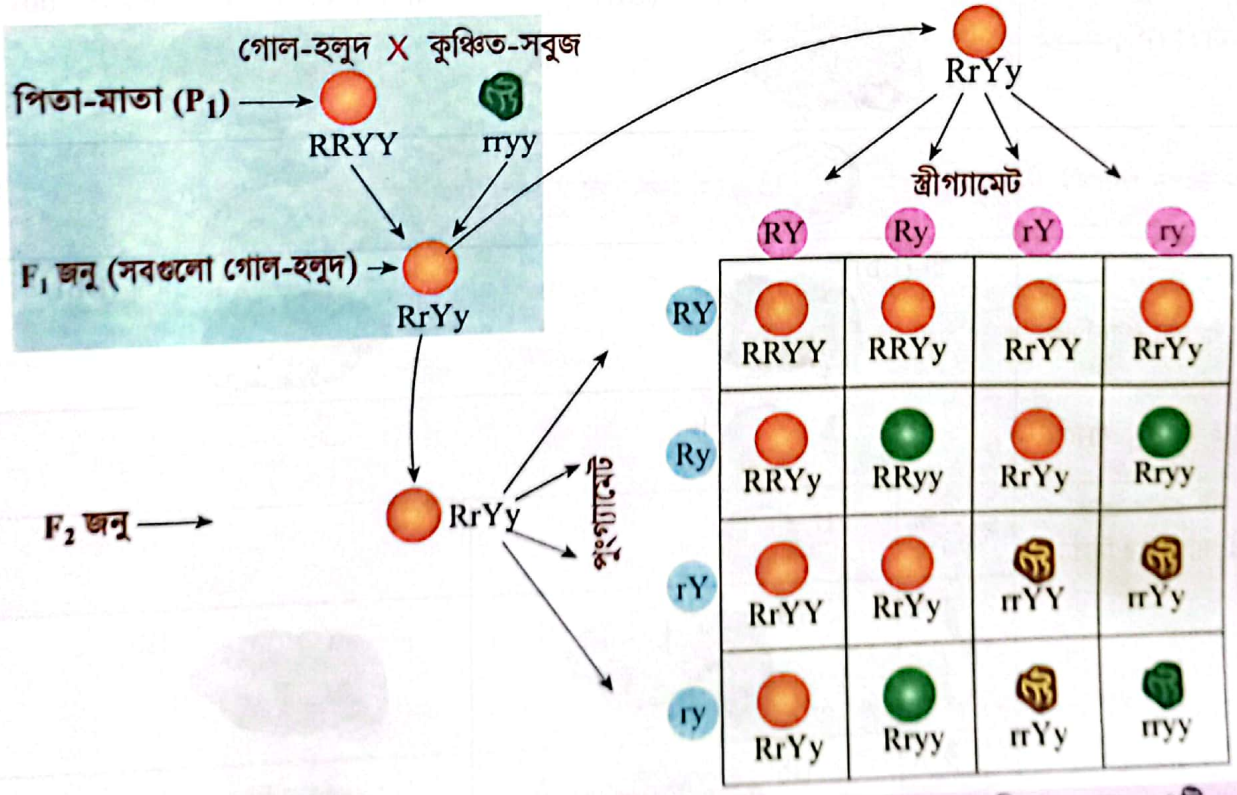

ফলাফল : গোল-হলুদ = ৯টি, গোল-সবুজ = ৩টি, কুঞ্চিত-হলুদ= ৩টি এবং কুঞ্চিত-সবুজ = ১টি

অনুপাত = ৯ : ৩ : ৩ : ১

CamScanner

প্রাণীর বংশগতিতে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র অনুসরণ

সূত্র : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম সংকর পুরুষে (F_1) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ উৎপাদনকালে বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করবে।

গবেষণার ফল

একটি বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালোবর্ণ ও ছোটলোমধারী গিনিপিগের সাথে অপর একটি বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণ ও লম্বালোমযুক্ত গিনিপিগের ক্রস ঘটালে F_1 জনুতে যে সব গিনিপিগ উৎপন্ন হয়, তারা সবাই কালোবর্ণ-ছোটলোমধারী সংকর গিনিপিগ। এর কারণ হচ্ছে, কালোবর্ণ ও ছোটলোম– এ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট। অপরদিকে বাদামীবর্ণ ও লম্বালোম প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। F_1 জনুর গিনিপিগের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_2 জনুতে নিম্নোক্ত চার ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গিনিপিগ পাওয়া যায়।

১. কালোবর্ণ ও ছোটলোমযুক্ত;
২. কালোবর্ণ ও লম্বালোমযুক্ত;
৩. বাদামীবর্ণ ও ছোটলোমযুক্ত এবং
৪. বাদামীবর্ণ ও লম্বালোমযুক্ত।

উপরোক্ত গিনিপিগগুলোর সংখ্যার অনুপাত সব ক্ষেত্রেই ৯ : ৩ : ৩ : ১–এ হারে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা

ধরা যাক–

B = কালোবর্ণের জন্য দায়ী জিন;
b = বাদামীবর্ণের জন্য দায়ী জিন;
S = ছোটলোমের জন্য দায়ী জিন;
s = লম্বালোমের জন্য দায়ী জিন;
F_1 জনু = প্রথম বংশধর বা প্রথম সংকর পুরুষ;
F_2 জনু = দ্বিতীয় বংশধর বা দ্বিতীয় সংকর পুরুষ।

যেহেতু জীবের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে জিন থাকে, অতএব–
বিশুদ্ধ কালোবর্ণ ও ছোটলোমের জিনোটাইপ = BBSS এবং
বিশুদ্ধ বাদামীবর্ণ ও লম্বালোমের জিনোটাইপ = bbss হবে।

BBSS জিনোটাইপ সম্পন্ন গিনিপিগ BB এবং bbss গিনিপিগ bs ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন করবে। এ দুধরনের গ্যামেটের মিলনে F_1 জনুতে সকল অপত্য গিনিপিগই **কালোবর্ণ ও ছোটলোমযুক্ত (BbSs)** হবে; কারণ কালোবর্ণ (B) ও ছোটলোমের (S) জিন বাদামী বর্ণ (b) ও লম্বালোমের (s) জিনের উপর প্রকট।

এখন দেখা যাচ্ছে, F_1 জনুর সংকরে চার ধরনের অ্যালীল রয়েছে, যেমন–কালোবর্ণের জন্য B, বাদামীবর্ণের জন্য b, ছোটলোমের জন্য S এবং লম্বালোমের জন্য s। জননকোষ সৃষ্টির সময় এ চার ধরনের অ্যালীল স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে চার ধরনের গ্যামেট তৈরি করবে, যথা– BS, Bs, bS এবং bs। নিষেকের সময় গ্যামেটগুলো যথেচ্ছভাবে (at random) অর্থাৎ একটি পুংগ্যামেট চার রকম স্ত্রীগ্যামেটের যে কোনোটির সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। ফলে F_2 জনুতে ১৬ ধরনের সদস্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এদের ফিনোটাইপিক ফলাফল হবে নিম্নরূপ :

৯টি = কালো ছোটলোম
৩টি = কালো লম্বালোম
৩টি = বাদামী ছোটলোম
১টি = বাদামী লম্বালোম

অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১

এ পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত টানা যায় যে দু'সেট অ্যালীলের সদস্যরা F_2 জনুতে পৃথক হয়ে যায়। অ্যালীলের একসেট অপর সেটের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জাইগোট সৃষ্টিকালে স্বাধীনভাবে মিলিত হয়। ফলে এক্ষেত্রে দু'জোড়া নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে, যথা : **কালোবর্ণ-লম্বালোম** এবং **বাদামীবর্ণ-ছোটলোম**।

অপর পাতায় চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ফলাফল দেখানো হলো।

CamScanner

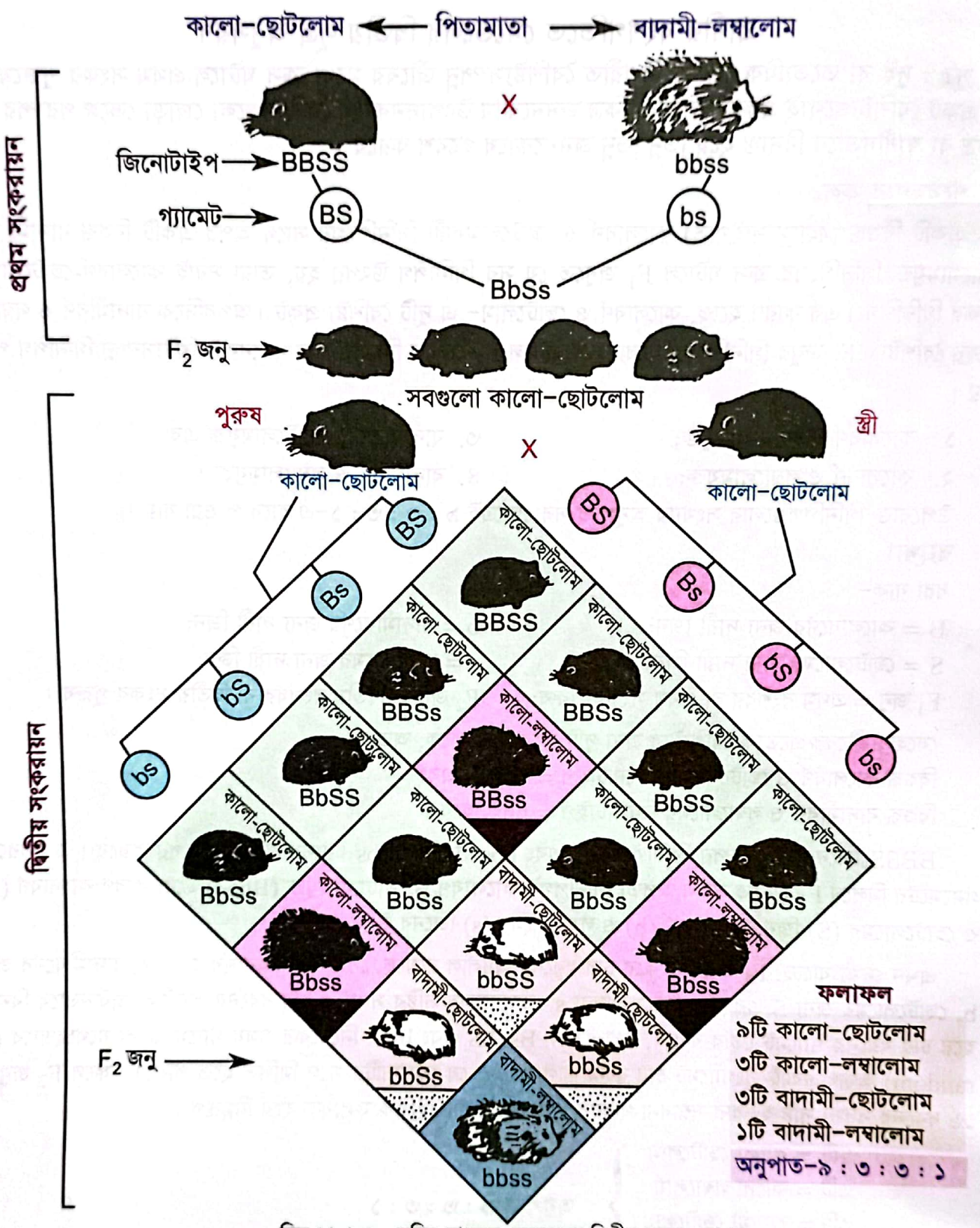

চিত্র ১১.১.৬ : ছবির মাধ্যমে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)

মেন্ডেল তাঁর সংকরায়ন পরীক্ষার ফল থেকে বুঝতে পারেন যে কোনো জীবের প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি উপাদান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উপাদান জীবদেহে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট গঠনকালে ঐ উপাদান সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু উপাদানটি কী, গ্যামেটের কোথায় এটি অবস্থিত এবং এসব উপাদান কীভাবে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এসব বিষয়ে মেন্ডেল অবগত ছিলেন না।

CamScanner

১৯০০ সালে মেন্ডেল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারের পর ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা এবং দেহকোষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। জোড়ার একটি পিতার কাছ থেকে, অপরটি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। অর্থাৎ মানুষের দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে পিতার কাছ থেকে, বাকি ২৩টি মায়ের কাছ থেকে। ২৩টি করে ক্রোমোজোম শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে থাকে, দুটি কোষের মিলনে ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে **জাইগোট** কোষের সৃষ্টি হয়। মেন্ডেল একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া উপাদানের কথা বলেছিলেন, যার একটি পিতা ও একটি মাতার কাছ থেকে আসে, যেমনটি ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

১৯০২ সালে আমেরিকান জিনতত্ত্ববিদ **সাটন** (W. S. Sutton, 1877-1916) ও জার্মান জীববিজ্ঞানী **বোভেরি** (Theodor Boveri, 1862-1915) পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে মিলের কথাটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। এ নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন জীবজন্তুর উপর গবেষণা চলেছে। পরে জানা গেল যে মেন্ডেলের উপাদান বা জিনের অবস্থান ক্রোমোজোমে, তাই বংশানুক্রমিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে ক্রোমোজোম আর উপাদানের মধ্যে এত সাদৃশ্য। গবেষণার ফলাফল থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জিন ও ক্রোমোজোম অনেক দিক দিয়ে একই রকম আচরণ করে। তা ছাড়া বংশগতি নির্ধারণের সময় জিন ও ক্রোমোজোম সমান্তরাল আচরণ প্রদর্শন করে। একেই **বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব** বলা হয়।

সাটন ও বোভেরি প্রবর্তিত তত্ত্বের আলোকে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের মূল ভিত্তি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. একমাত্র শুক্রাণু ও ডিম্বাণুই যেহেতু বংশপরম্পরার সেতু হিসেবে কাজ করে তাই সমস্ত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যেই বাহিত হয়।

২. জাইগোট সৃষ্টিতে যেহেতু শুক্রাণুর মস্তকে অবস্থিত **নিউক্লিয়াস** অংশগ্রহণ করে, তাই ধারণা করা যায় যে জননকোষের নিউক্লিয়াসই বংশগতি পদার্থ বহন করে।

৩. নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম থাকে, অতএব ক্রোমোজোমই বংশগতি পদার্থ বহন করে।

৪. প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম বা ক্রোমোজোম-জোড় নির্দিষ্ট জীবের পরিস্ফুটনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। একটি ক্রোমোজোম বা অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে জীবদেহে অঙ্গহানি ও কার্যগত অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

৫. বংশগতি পদার্থের মতো ক্রোমোজোমও জীবদেহে আজীবন ও বংশপরম্পরায় তাদের সংখ্যা, গঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখে। কোনোটাই হারিয়ে যায় না বা একীভূত হয় না, বরং একক-এর মতো আচরণ করে।

৬ ডিপ্লয়েড (2n) কোষে (দেহকোষে) ক্রোমোজোম ও জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।

৭. ক্রোমোজোমে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে (লোকাসে) জিন অবস্থান করে।

৮. মিয়োসিসের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোম-জোড় ও জিন স্বাধীনভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে জননকোষে প্রবেশ করে।

৯. একটি গ্যামেট একসেট ক্রোমোজোম ও অ্যালিল বহন করে।

১০. নিষেক প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হওয়ায় অপত্য জীবদেহে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম ও জিনসংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Deviations of Mendel's Laws)

মেন্ডেলের বংশগতি সম্বন্ধীয় সূত্র আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবে ঐ একই ধরনের পরীক্ষা করে দেখেন যে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মেন্ডেলের পরীক্ষার ফলাফলের অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই। এসব ফলাফল মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনভাবে মিলন সূত্রের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। নিচে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ব্যতিক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো।

CamScanner

প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম

১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance) – ফলাফল ১ : ২ : ১

যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটে কিন্তু প্রথম বংশধরে (F_1 জনুতে) প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে **অসম্পূর্ণ প্রকটতা** বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে **ইন্টারমিডিয়েট জিন** (intermediate gene) বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১ : ২ : ১ হয়।

উদাহরণ : সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*)-র লাল ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদের সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে গোলাপী (pink) বর্ণের ফুল পাওয়া যায়। প্রথম বংশধরের উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন দ্বিতীয় বংশধরে লাল, গোলাপী ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২ : ১।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক– ফুলের লাল বর্ণের প্রতীক = R, সাদা বর্ণের প্রতীক = r

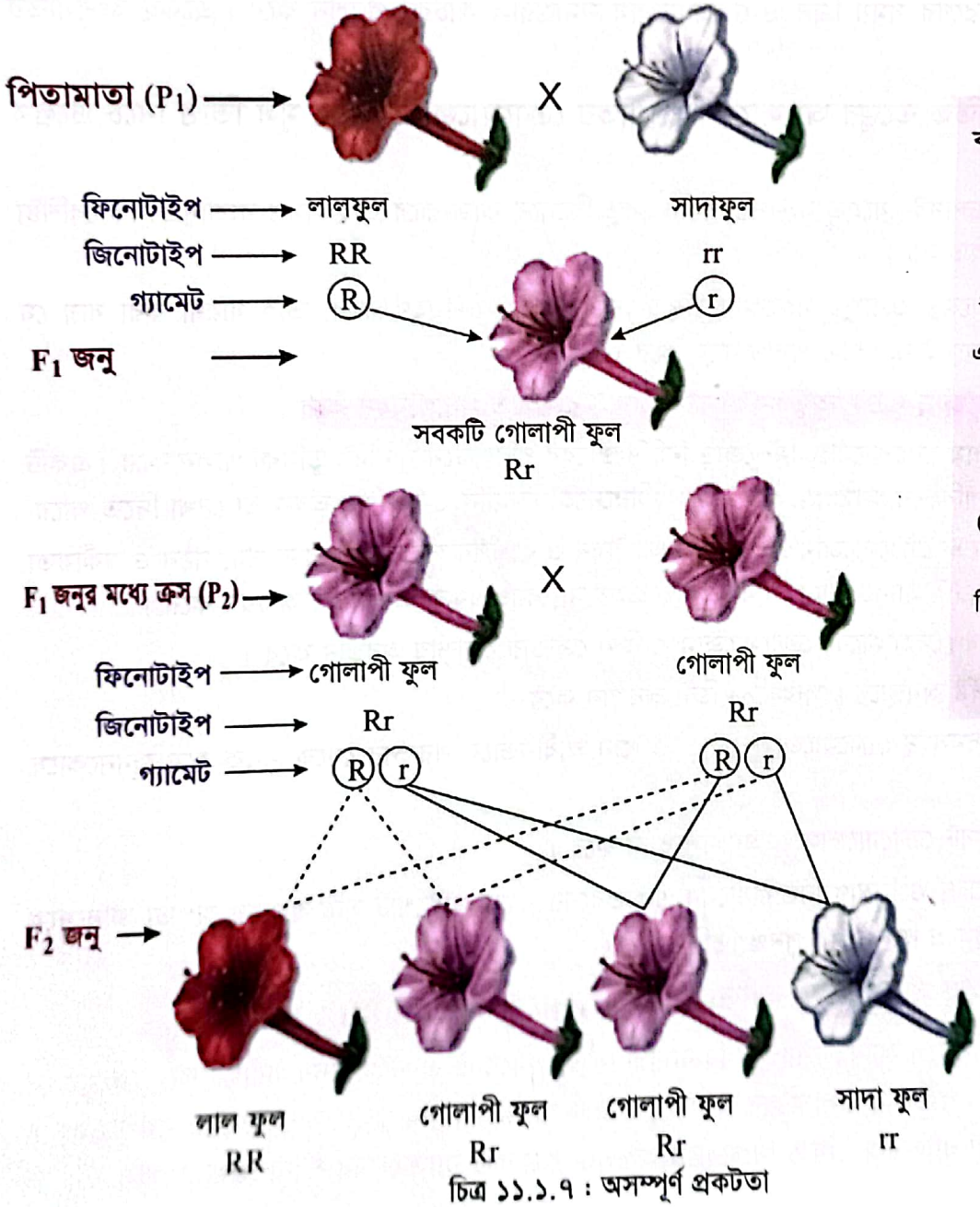

চিত্র ১১.১.৭ : অসম্পূর্ণ প্রকটতা

ব্যাখ্যা : এখানে লাল ফুলের জন্য RR এবং সাদা ফুলের জন্য rr জিন দেখানো হয়েছে। R-এর সম্পূর্ণ প্রকটতা থাকলে F_1 উদ্ভিদের ফুল লাল রং-এর হতো এবং F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক অনুপাত হতো ৩ : ১। কিন্তু R-এর অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই F_1 হেটারোজাইগাস (Rr)- এর বর্ণ গোলাপী (Pink) এবং F_2 বংশধরে ১ : ২ : ১ ফিনোটাইপিক অনুপাতের (লাল, গোলাপী, সাদা) সৃষ্টি হয়েছে।

CamScanner

২. সমপ্রকটতা (Co-dominance) – ফলাফল ১ : ২ : ১

সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দুটি অ্যালিল হেটারোজাইগাস অবস্থায় যখন প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের পরিবর্তে উভয়েই সমানভাবে প্রকাশিত হয়, তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে সমপ্রকটতা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বলে। এতে মেন্ডেলিয়ান ৩ : ১ অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে ১: ২ : ১ রূপে প্রকাশ পায়।

কালো ও সাদা বর্ণের আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে সমপ্রকটতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে কালো পালক (BB) এবং সাদা পালক (WW)-এর মোরগ-মুরগিতে ক্রস ঘটানো হলে F_1 জনুর সকল মোরগ-মুরগিই কালো বা সাদা না হয়ে সমপ্রকটতার কারণে কালোর মাঝে সাদা চেকযুক্ত (BW) হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

পিতা–মাতা (P_1) : ⟶ কালো বর্ণের মোরগ X সাদা বর্ণের মুরগি

জিনোটাইপ ⟶ BB WW

গ্যামেট ⟶ B W

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ BW

ফিনোটাইপ ⟶ সবকটি কালোর মাঝে সাদা চেকযুক্ত (checkered) মোরগ-মুরগি

পিতা–মাতা (P_2) : ⟶ চেকযুক্ত মোরগ X চেকযুক্ত মুরগি

জিনোটাইপ ⟶ BW BW

গ্যামেট ⟶ B W X B W

F_2 জনু : জিনোটাইপ ⟶ BB BW BW WW

ফিনোটাইপ ⟶ (কালো) (চেকযুক্ত) (চেকযুক্ত) (সাদা)

অনুপাত : ১ : ২ : ১

৩. মারণ জিন বা লিথাল জিন (Lethal Gene) – অনুপাত ২ : ১

যেসব জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে সেসব জিনকে লিথাল জিন বলে। কোনো জিনের মিউটেশন (mutation; বংশগত বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তন) ঘটার পর সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে।

লিথাল জিনের প্রভাবকে লিথালিটি (lethality) বলে। লিথাল জিনের লিথাল প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য প্রভাব থাকে। লিথাল প্রভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লিথাল জিন প্রকট বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে। প্রকট লিথালের ক্ষেত্রে জীব হোমাজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই মারা যায়। এ ধরনের জিনবাহক সাধারণত জাইগোট অবস্থায় কিংবা ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় বা জন্মের পরমুহূর্তেই মারা যায়। কাজেই প্রকট লিথাল জিনবাহক কোনো বংশধর রেখে যেতে পারে না, তাই প্রকৃতিতে প্রকট লিথাল জিনবিশিষ্ট জীব পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, প্রচ্ছন্ন লিথালের ক্ষেত্রে জীব কেবল হোমোজাইগাস হলে মারা যায়, হেটারোজাইগাস হলে মারা যায় না। অধিকাংশ জীবেই এক বা একাধিক প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন রয়েছে। কিন্তু সচরাচর হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে বলে এদের উপস্থিতি অতোটা বুঝা যায় না। তবে একই লিথাল জিনবাহী

CamScanner

দু'টি হেটারোজাইগাস জীবের মধ্যে প্রজনন হলে পরবর্তী বংশে ঐ লিথাল জিন হোমোগাইজাস অবস্থায় আসতে পারে এবং তার লিথাল প্রভাব প্রকাশ করতে পারে। সেজন্য নিকট সম্পর্কীয় লোকদের মধ্যে বিবাহ হলে কোনো বিশেষ লিথাল জিন কখনও কখনও হোমোজাইগাস অবস্থায় তাদের সন্তানের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য

১. লিথাল জিন একধরনের **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

২. প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু কিংবা আঙ্গিক বৈকল্য ঘটাতে পারে।

৩. প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজোইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।

৪. জাইগোট বা ভ্রূণ অবস্থায় জীব মারা যায় বলে লিথান জিনের প্রভাব চোখে পড়েনা, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রকাশ ঘটে।

৫. লিথাল জিনের প্রভাবে ৩ : ১ অনুপাতের পরিবর্তে ২ : ১ অনুপাত প্রকাশিত হয়।

ফরাসী জিনতত্ত্ববিদ **লুসিয়েন ক্যুয়েনো** (Lucien Cuetnot, 1905) সর্বপ্রথম ইঁদুরের গায়ের বর্ণের ক্ষেত্রে লিথাল জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। তাঁর পরীক্ষায় দেখা যায় যে দুটি **হলুদ** বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করানো হলে সব সময়ই ২ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে হলুদ ও অ্যাগাউটি (কালচে-বাদামী) রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। পরবর্তী গবেষকরা প্রমাণ করেন যে দুটি হলুদ বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করা হলে ২৫% ইঁদুর ভ্রূণীয় অবস্থায়ই মারা যায়। তাই **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়।**

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের **হলুদ** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রকট জিন **Y** এবং **অ্যাগাউটি** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন **y**.

মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে YY এবং বিশুদ্ধ অ্যাগাউটি বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে yy. কিন্তু প্রকৃতিতে যে সব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তার কোনটিই বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস (YY) জিনোটাইপধারী নয়। কারণ Y জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিন হিসেবে কাজ করে ভ্রূণ অবস্থায় ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। তাই **প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তারা সবাই হেটারোজাইগাস অর্থাৎ সংকর** (Yy) প্রকৃতির।

পিতা-মাতা : ফিনোটাইপ → পুরুষ হলুদ ইঁদুর (সংকর) X স্ত্রী হলুদ ইঁদুর (সংকর)

জিনোটাইপ → Yy Yy

গ্যামেট → Y y X Y y

নিষেকের ফলাফল চৈকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো

♀ \ ♂	Y	y
Y	মৃত YY	হলুদ Yy 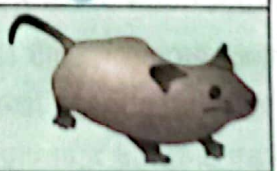
y	হলুদ Yy	অ্যাগাউটি yy

অনুপাত = ২টি হলুদ (Yy) : ১টি অ্যাগাউটি (yy)

CamScanner

সেমিলিথাল ও সাবভাইটাল জিন

এমন কিছু লিথাল জিনও পাওয়া যায়, যার প্রভাবে বাহক জীব একেবারে ছোট অবস্থায় মারা যায় না। তারা বড় হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধিও ঘটায়। যে সব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর বেশি জীব মারা যায় সেগুলোকে **সেমিলিথাল জিন** (semilethal gene) বলে। অন্যদিকে, যেসব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর কম সংখ্যক জীব মারা যায় সেগুলোকে বলে **সাবভাইটাল জিন** (subvital gene)। মানুষে **হিমোফিলিয়া** রোগ সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সেমিলিথাল ধরনের। **ড্রসোফিলা** মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সাবভাইটাল ধরনের।

মানুষের লিথাল জিনঘটিত কয়েকটি বংশগত রোগ

থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) : প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনের প্রকাশের কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। রক্তাল্পতা, যকৃতস্ফীতি, প্লীহাস্ফীতি, দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, মাথা বড় হওয়া, RBC ছোট ও সংখ্যায় কমে যাওয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ভিকটিম সাধারণত শিশু অবস্থায় মারা যায়। এটি "ভূমধ্যসাগরীয় রোগ" (Thalassa = সাগর) নামেও পরিচিত।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া (Sickle Cell Anaemia) : প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনের প্রকাশের কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। ভিকটিমের রক্তে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় যার ফলে RBC সিকল বা কাস্তে আকৃতি ধারণ করে এবং দ্রুত ভেঙ্গে যায়, ফলে **তীব্র অ্যানিমিয়া** বা রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এ ছাড়া রোগীর শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক রোগ, হৃদরোগ, বাত, সর্বাঙ্গে ব্যথা, কিডনি রোগ ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। মারাত্মক রক্তাল্পতার কারণে রোগী অল্প বয়সেই মারা যায়।

সিস্টিক ফাইব্রোসিস (Cystic Fibrosis) : প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনের প্রকাশের কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। জন্মের ২–৩ বছরের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগটি বেশি বয়সে প্রকাশিত হয়। রোগটি প্রধানত শ্বসনতন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র ও জননতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত তন্ত্রের নালিসমূহের প্রাচীরগাত্রের মিউকাস গ্রন্থিগুলো অত্যন্ত ঘন আঠালো মিউকাস নিঃসরণ করে যা জমে গিয়ে নালিপথ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সংশ্লিষ্ট তন্ত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন– নিরন্তর কাঁশি, শ্বাসকষ্ট, ঘন কফ, কফের সাথে রক্ত, নাক বন্ধ, সাইনুসাইটিস, বুক ও পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, হজমে গণ্ডগোল, পিত্ত পাথুরি, লিভার সিরোসিস, নারী ও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি। সাধারণত ৩০–৪০ বছর বয়সের মধ্যেই রোগী মারা যায়।

রেটিনোব্লাস্টোমা (Retinoblastoma) : একটি প্রকট লিথাল জিনের প্রকাশের কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। তবে এ জিনের বাহক কদাচিৎ বেঁচে থাকে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য এ জিনকে **সেমিলিথাল জিন**ও বলা হয়। ভিকটিমের চোখে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী শৈশবে মারা যায়।

ব্রাকিফ্যালাঞ্জি (Brachyphalangy) : একটি লিথাল জিনের অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। ভিকটিমের হাতের আঙ্গুলগুলো বেশ খাটো হয়। আঙ্গুলের মাঝখানের হাড়টি উপরের বা নিচের হাড়ের সাথে জুড়ে যায়। এদের আঙ্গুলে তিনটি গাটের (joint) পরিবর্তে দু'টি গাট থাকে। কিছুটা ক্ষতি হলেও এ জিনের প্রভাবে বাহকের মৃত্যু হয় না, তাই এটি একটি সেমিলিথাল জিন।

কনজেনিটাল ইকথিওসিস (Congenital Ichthyosis) : প্রচ্ছন্ন লিথাল জিনের প্রকাশের কারণে শিশুদের এ রোগ হয়। জন্মের পর শিশুর ত্বক শুষ্ক, পুরু এবং ফেটে গিয়ে মাছের আঁইশের মতো হয়ে যায়। রোগী জন্মের পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

মিউটেশন (Mutation) বা পরিব্যক্তি : বংশগত বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তনকে **মিউটেশন** বলে। জিনের গঠনে (ক্ষারকের বিন্যাসে) অথবা ক্রোমোজোম সংখ্যা বা এর গঠনগত কোন পরিবর্তন ঘটলে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। তবে মিউটেশন বলতে সাধারণত **জিন মিউটেশন**কে বোঝায়। পরিব্যক্তির ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। আয়নিত বিকিরণ ও কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে **কৃত্রিম মিউটেশন** ঘটানো যায়।

CamScanner

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম

১. পরিপূরক জিন (Complementary Gene) – ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৭

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন জিনদুটিকে পরস্পরের পরিপূরক জিন বলে এবং এ অবস্থাকে সহপ্রকটতা বলা হয়।

Lathyrus odoratus নামক মিষ্টি মটর উদ্ভিদে সাদা ফুলবিশিষ্ট দুটি আলাদা **স্ট্রেইন** (strain) পাওয়া যায়। এ স্ট্রেইনদুটির মধ্যে সংকরায়ন করলে F_1 জনুর সব উদ্ভিদের ফুল **বেগুনি** হয়। কিন্তু F_2 জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ৯ : ৭।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক, সাদা ফুলবিশিষ্ট স্ট্রেইন দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে AAbb এবং aaBB। এদের সংকরায়নের ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো।

পিতা–মাতা (P_1) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর × ♀ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

জিনোটাইপ ⟶ AAbb × aaBB

গ্যামেট ⟶ Ab Ab × aB aB

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb AaBb AaBb

ফিনোটাইপ ⟶ সবগুলো বেগুনি ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ বেগুনি ফুল × ♀ বেগুনি ফুল

জিনোটাইপ ⟶ AaBb × AaBb

গ্যামেট ⟶ AB Ab aB ab × AB Ab aB ab

F_2 জনু ⟶

স্ত্রীগ্যামেট \ পুংগ্যামেট	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB বেগুনি ফুল	AABb বেগুনি ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল
Ab	AABb বেগুনি ফুল	AAbb সাদা ফুল	AabB বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল
aB	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	aaBB সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল
ab	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল	aabb সাদা ফুল

ফিনোটাইপের অনুপাত = ৯টি বেগুনি ফুল : ৭টি সাদা ফুল

ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে প্রকট জিন A ও B একত্রে ক্রিয়া করে থাকে। উপরের চেকার বোর্ডে দেখা যায় যেসব জিনোটাইপে A ও B একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে A বা B অর্থাৎ ঐ দুটি জিনের মাত্র একটি আছে বা কোনটিই নেই সেসব ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। পরিপূরক জিনের ক্রিয়ার ফলেই F_2 জনুর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে ৯ : ৭ অনুপাত সৃষ্টি হয়েছে।

CamScanner

২. এপিস্ট্যাসিস (Epistasis)

কিছু ক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়। এভাবে, **একটি জিন যখন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক** (non-allelic) **জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে**। যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় সে জিনকে **এপিস্ট্যাটিক জিন** (epistatic gene), আর যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিনটিকে **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** (hypostatic gene) বলে।

ক. প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant Epistasis) – অনুপাত ১৩ : ৩

যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে **বেটসন** (Bateson) এবং **পানেট** (Punnett) পরিচালিত এক পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় যে সাদা লেগহর্ণ (Leghorn) গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (C) থাকে। কিন্তু এপিস্ট্যাটিক জিন (I)-এর কারণে রঙিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো সাদা হয়। F_1 জনুতে সব সাদা পালক-বিশিষ্ট হলেও F_2 জনুতে ১৩ : ৩ অনুপাতে সাদা ও রঙিন পালক-বিশিষ্ট মোরগ-মুরগী সৃষ্টি হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ধরা যাক, সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন C এবং
সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন I।
অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ হবে **CCII** এবং সাদা ওয়াইনডটের জিনোটাইপ হবে ccii।
অর্থাৎ এক্ষেত্রে C হচ্ছে প্রকট **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** এবং I প্রকট **এপিস্ট্যাটিক জিন**।

পিতা–মাতা (P_1) : ♂ সাদা লেগহর্ণ × ♀ সাদা ওয়াইনডট

জিনোটাইপ → CCII ccii

গ্যামেট → CI ci

F_1 জনু → CcIi (সাদা)

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂CcIi (সাদা) × ♀CcIi (সাদা)

F_2 জনু →

♀ \ ♂	CI	Ci	cI	ci
CI	CCII সাদা	CCIi সাদা	CcII সাদা	CcIi সাদা
Ci	CCIi সাদা	CCii রঙিন	CcIi সাদা	Ccii রঙিন
cI	CcII সাদা	CcIi সাদা	ccII সাদা	ccIi সাদা
ci	CcIi সাদা	Ccii রঙিন	ccIi সাদা	ccii সাদা

অনুপাত = ১৩ (সাদা) : ৩ (রঙিন)

চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিন I এর উপস্থিতি C জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল I এর অনুপস্থিতিতেই C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। জিন I বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, দমিত থাকে।

CamScanner

খ. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis) — অনুপাত ৯ : ৭

দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল যখন পরস্পরের (একে অপরের) প্রকট অ্যালিলকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

মানুষে জন্মগত মূক-বধিরতা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের অন্যতম উদাহরণ। দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এর জন্য দায়ী। এ দুটি জিনের একটি যখন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে তখন অন্য প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। অর্থাৎ উল্লিখিত দুজোড়া প্রচ্ছন্ন জিনের যেকোনো একজোড়া থাকলে এবং অন্য জোড়ার প্রকট জিন থাকলেও যেকোনো ব্যক্তি জন্মগত মূকবধির (deaf-mute) হবে। এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জিন-জোড় প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মনে করি d ও e দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব ddEE ও DDee জিনোটাইপধারী ব্যক্তি মূকবধির হবে। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন d ও e হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন EE ও DD বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। তাই মূকবধিরতা প্রকাশ পায়।

পিতা–মাতা (P_1) : ফিনোটাইপ → ♂ মূকবধির × ♀ মূকবধির

জিনোটাইপ → DDee × ddEE

গ্যামেট → De, dE

F_1 জনু : জিনোটাইপ → DdEe

ফিনোটাইপ → সবাই স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম × ♀ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম

জিনোটাইপ → DdEe × DdEe

গ্যামেট → DE, De, dE, de × DE, De, dE, de

F_2 জনু →

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	DE	De	dE	de
DE	DDEE স্বাভাবিক	DDEe স্বাভাবিক	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক
De	DDEe স্বাভাবিক	DDee মূকবধির	DdEe স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির
dE	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক	ddEE মূকবধির	ddEe মূকবধির
de	DdEe স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির	ddEe মূকবধির	ddee মূকবধির

ফলাফল : ৯ সন্তান স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম এবং ৭ সন্তান মূকবধির

একজন মূকবধির পুরুষের (DDee) সাথে একজন মূকবধির মহিলার (ddEE) বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। ঐ সন্তানদের জিনোটাইপের অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূকবধির সন্তান ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে। উপরের ছকের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

জীববিজ্ঞানে যে সকল প্রতীক ব্যবহৃত হয় এদের মধ্যে ♂ এবং ♀ প্রধান। পুরুষ জীবকে ♂ এবং স্ত্রী জীবকে ♀ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ♂ চিহ্নটি রোমানদের রণদেবতা মারস (Mars) এর ঢাল (shield) ও বর্শা (spear) নির্দেশ করে। ♀ চিহ্নটি রোমানদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস (Venus) এর হাত আয়না (hand mirror) নির্দেশ করে।

CamScanner

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance) বা বহুজিনীয় উত্তরাধিকার

মেন্ডেলের মতে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া **ফ্যাক্টর** বা জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে **বিভিন্ন লোকাসে অবস্থানকারী (নন-অ্যালিলিক) একাধিক জিন জীবের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে**। যেমন-মানুষের উচ্চতা, গায়ের রং, চোখের রং, ওজন, বুদ্ধমত্তা; গাভির দুধ; ভুট্টা বা গমের দানার রং ইত্যাদি **পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য** (quantitative traits) একাধিক জিনের সমন্বিত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়।

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত নন-অ্যালিলিক জিনের একটি গ্রুপ সম্মিলিতভাবে কোন জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করলে তখন সেই জিন-গ্রুপকে **পলিজিন** (polygene) বলে। **পলিজিনে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের বংশগতিকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলা হয়**। জিনতত্ত্ববিদ K. Mather, ১৯৫৪ সালে **পলিজিন** নামকরণ করেন। পলিজিনের প্রভাব **ক্রমবর্ধিষ্ণু** (cumulative) হওয়ায় এমন বৈশিষ্ট্যকে **মাত্রিক চরিত্র** (quantitative character) বলা হয়। মানুষের অনেক বংশগতিয় রোগ পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্টি হয়, যেমন-অটিজম, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

১৯০৮ সালে সুইডিস বিজ্ঞানী Nilsson-Ehle গমের বীজের রং নিয়ে পরীক্ষা করার সময় **লাল** বীজযুক্ত গমের সাথে **সাদা** বীজযুক্ত গমের সংকরায়ন ঘটান। F_1 বংশধরে তিনি সকল গমের রং **মধ্যম লাল** পেলেও F_2 বংশধরে ১৫টি লাল এবং ১টি **সাদা** শস্যযুক্ত উদ্ভিদ পান। তিনি ১৫টি লাল শস্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে লালবর্ণের গাঢ়ত্বের তারতম্য লক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই তারতম্য বিচার করে তিনি ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ (গাঢ় লাল : লাল : মধ্যম লাল : ফিকে লাল : সাদা) অনুপাত পেয়েছিলেন।

মানুষের গাত্রবর্ণ (Skin color in Man) : পৃথিবীতে নিগ্রোদের মতো **কুচকুচে কালো** থেকে শুরু করে ককেসিয়ানদের মতো **ধবধবে ফর্সা** তথা **শ্বেতাঙ্গ** পর্যন্ত নানা প্রকার গায়ের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিয়ে হলে এদের সন্তানদের গায়ের বর্ণ মাঝামাঝি অর্থাৎ **মিউল্যাটো** (mulatto) হয়। মিউল্যাটোদের মধ্যে বিয়ে হলে নানা ধরনের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে বিয়ের ফলে সৃষ্ট মিউল্যাটোদের (মাঝারি বর্ণ) গায়ের বর্ণের উত্তরাধিকার পলিজেনিক উত্তরাধিকারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ধরি, নিগ্রোদের বর্ণ সৃষ্টিকারী দুজোড়া জিন হচ্ছে AABB এবং শ্বেতাঙ্গদের এ রকম দুজোড়া জিন aabb। এ ধরনের নিগ্রো পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গ মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের ক্রসের ফলে সৃষ্ট F_1 জনুর জিনোটাইপ হয় AaBb এবং ফিনোটাইপ হয় **মিউল্যাটো** বা মাঝামাঝি। F_1 জনুর মিউল্যাটো বা মাঝামাঝিদের মধ্যে ক্রস করলে F_2 তে নানা রকম গায়ের রংবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। এসব জিনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকটতা (dominance) নেই। **প্রকট জিনের সংখ্যা যত বেশি হবে গায়ের রং-এর গাঢ়ত্ব তত বেড়ে যাবে।**

C. B. Davenport ১৯১৩ সালে প্রমাণ করেন যে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের গায়ের রং-এর বংশগতি দুজোড়া জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিগ্রোদের দুজোড়া বর্ণ সৃষ্টিকারী জিন রয়েছে যা **মেলানিন** (melanin; মেরুদন্ডী প্রাণীর ত্বকে উপস্থিত কালো বা গাঢ় বাদামী বর্ণের রঞ্জক) সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এসব জিনে কোনো প্রকটতা দেখা যায় না। তবে এদের সমপরিমাণ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব দেখা যায়। শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এ জিনগুলোর অ্যালিল মেলানিন সঞ্চয়ে সাহায্য করে না।

একজন নিগ্রো পুরুষের সাথে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিয়ে হলে F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল অপর পাতায় চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো।

CamScanner

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স-এর জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

পিতা-মাতা (P_1) : ফিনোটাইপ → ♂ নিগ্রো × ♀ শ্বেতাঙ্গ

জিনোটাইপ → AABB × aabb

গ্যামেট → AB, AB, ab, ab

F_1 → AaBb, AaBb, AaBb, AaBb

সকলেই মিউল্যাটো (নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের মাঝামাঝি বর্ণ)

F_1 মিউল্যাটোদের মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂ মিউল্যাটো × ♀ মিউল্যাটো

জিনোটাইপ → AaBb × AaBb

গ্যামেট → AB, Ab, aB, ab × AB, Ab, aB, ab

F_2 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো–

♂ \ ♀	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB ① নিগ্রোদের অনুরূপ	AABb ② মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর কালো	AaBB ③ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর কালো	AaBb ④ মিউল্যাটো
Ab	AABb ⑤ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর কালো	AAbb ⑥ মিউল্যাটো	AaBb ⑦ মিউল্যাটো	Aabb ⑧ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর সাদা
aB	AaBB ⑨ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর কালো	AaBb ⑩ মিউল্যাটো	aaBB ⑪ মিউল্যাটো	aaBb ⑫ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর সাদা
ab	AaBb ⑬ মিউল্যাটো	Aabb ⑭ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর সাদা	aaBb ⑮ মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর সাদা	aabb ⑯ সাদা

(F_2 →)

নিগ্রো = ১ জন : গাঢ় বর্ণ = ৪ জন : মিউল্যাটো = ৬ জন : হালকা বর্ণ = ৪ জন : শ্বেতাঙ্গ = ১ জন

অর্থাৎ ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১

চেকার বোর্ডটির ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ১৬ জনের মধ্যে–

৪টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (১ নং ছকে) ১ জন নিগ্রো।

৩টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (২,৩, ৫, ৯ নং ছকে) ৪ জনের গায়ের রং গাঢ় বর্ণ (মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর কালো)।

২টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩ নং ছকে) ৬ জন মিউল্যাটো বা মাঝারি বর্ণ।

১টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (৮, ১২, ১৪, ১৫ নং ছকে) ৪ জনের গায়ের রং হালকা বর্ণ (মিউল্যাটোদের চেয়ে অধিকতর সাদা)।

বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিহীন (১৬ নং ছকে) ১ জন শ্বেতাঙ্গ।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, এখানে ১৬ জনের মধ্যে একজন ($B_1 B_1 B_2 B_2$) নিগ্রো এবং একজন ($b_1 b_1 b_2 b_2$) শ্বেতাঙ্গ হয়। ফলাফল থেকে আরো দেখা যায় যে, বর্ণ সৃষ্টিকারী প্রকট জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় আবার এ সকল জিনের সংখ্যা কম হলে ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশের তীব্রতা হ্রাস পায়।

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পার্থক্যসমূহ

মেণ্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে পার্থক্য

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র	মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র
১. এটি পৃথকীকরণ সূত্র নামে পরিচিত।	১. এটি স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র নামে পরিচিত।
২. এটি মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	২. এটি ডাই বা পলিহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৩. এক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ ঃ ১।	৩. ডাই-হাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১।
৪. এক্ষেত্রে শুধু জিনের পৃথকীকরণ হয়।	৪. এক্ষেত্রে জিনের পৃথকীকরণ ছাড়াও জিনের স্বাধীন সঞ্চারণ ঘটে।
৫. এক্ষেত্রে ২য় অপত্য বংশে শুধু প্যারেন্টাল টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।	৫. এক্ষেত্রে ২য় অপত্য বংশে প্যারেন্টাল ছাড়াও রিকম্বিন্যান্ট টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।
৬. ১ম সূত্র ২য় সূত্রকে অনুসরণ করে না।	৬. ২য় সূত্র ১ম সূত্রকে অনুসরণ করে।

অ্যালিলিক জিন ও নন-অ্যালিলিক জিনের মধ্যে পার্থক্য

অ্যালিলিক জিন	নন-অ্যালিলিক জিন
১. জোড়বাঁধা দু'টি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত জিন জুটির একটিকে অপরটির অ্যালিলিক জিন বলে।	১. জোড়বাঁধা দু'টি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত জিন জুটির একটিকে অপরটির নন-অ্যালিলিক জিন বলে।
২. এরা একই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।	২. এরা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. অ্যালিলিক জিনের আন্তঃক্রিয়াকে ডমিন্যান্স বা প্রকটতা বলে।	৩. নন-অ্যালিলিক জিনের আন্তঃক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সমপ্রকটতার মধ্যে পার্থক্য

অসম্পূর্ণ প্রকটতা	সমপ্রকটতা
১. এক্ষেত্রে প্রকট অ্যালিলটি আংশিক প্রকটতা দেখায়।	১. এক্ষেত্রে উভয় অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা দেখায়।
২. F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনোটিরই প্রকাশ ঘটে না। অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ পরিলক্ষিত হয়।	২. F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে একই সাথে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।
৩. কোনো অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায় না।	৩. উভয় অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায়।

মনোজেনিক ইনহেরিট্যান্স ও পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য

মনোজেনিক ইনহেরিট্যান্স	পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স
১. একটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণকে বলে মনোজেনিক ইনহেরিট্যান্স।	১. একাধিক স্বতন্ত্র জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণকে বলে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স।
২. জীবের গুণবাচক (qualitative) বৈশিষ্ট্যসমূহের মনোজেনিক ইনহেরিট্যান্স ঘটে।	২. জীবের পরিমাণবাচক (quantitative) বৈশিষ্ট্যসমূহের পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ঘটে।
৩. এক্ষেত্রে জিন ক্রিয়া স্বতন্ত্র।	৩. এক্ষেত্রে জিন ক্রিয়া সমন্বিত, সংখ্যাগত, সমপরিমাণ, সংযোজনশীল ও ক্রমবর্ধিষ্ণু।
৪. এক্ষেত্রে F_2 জনুর ফিনোটাইপে বিচ্ছিন্ন প্রকরণ দেখা যায়, তাই ফিনোটাইপগুলোকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক শ্রেণিভুক্ত করা যায়।	৪. এক্ষেত্রে F_2 জনুর ফিনোটাইপে অবিচ্ছিন্ন প্রকরণ দেখা যায়, তাই ফিনোটাইপগুলোকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক শ্রেণিভুক্ত করা যায় না।
৫. এক্ষেত্রে মেন্ডেলিয়ান অনুপাত পাওয়া যায়, তাই এটি মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স।	৫. এক্ষেত্রে মেন্ডেলিয়ান অনুপাত পাওয়া যায় না, তাই এটি নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স।

CamScanner

লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Sex Determination, XX–XY, XX–XO)

যে ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জীবের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, তাকে সেক্স ক্রোমোজোম বলে। এ ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারনত X ও Y বা O ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মানুষের প্রতিকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে **২২ জোড়া** উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে **অটোজোম** (autosome) বলে। কিন্তু **২৩তম জোড়ার** ক্রোমোজোম নারী ও পুরুষ সদস্যে ভিন্নতর এবং এগুলোকে **হেটারোজোম** (heterosome) বা **সেক্স ক্রোমোজোম** (sex chromosome) বলা হয়।

নারী সদস্যে যেসব গ্যামেট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু X ক্রোমোজোম থাকে। এ কারণে নারীকে **হোমোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হোমোগ্যামেট** বলে। অন্যদিকে, পুরুষ সদস্যে দুধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গ্যামেটে থাকে X ক্রোমোজোম, অন্য ধরনের গ্যামেটে থাকে Y ক্রোমোজোম। পুরুষকে তাই **হেটারোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হেটারোগ্যামেট** বলে।

পুরুষ হেটারোগ্যামেসিস প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত দু'প্রকার।

১. XX–XY পদ্ধতি

(মানুষ, ড্রসোফিলাসহ বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ এবং গাঁজা, তেলাকুচা প্রভৃতি উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ)

এ পদ্ধতি অনুযায়ী স্ত্রী **হোমোগ্যামেটিক** বা XX এবং পুরুষ **হেটারোগ্যামেটিক** বা XY। স্ত্রী মাত্র এক ধরনের ডিম্বাণু (X) উৎপন্ন করে। কিন্তু পুরুষ দুরকমের শুক্রাণু (X এবং Y) সৃষ্টি করে। X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে X-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **কন্যা** (XX) সন্তান এবং X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে Y-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **পুরুষ** (XY) সন্তান জন্ম হবে।

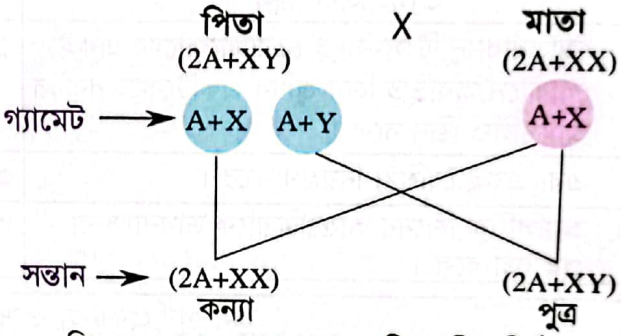

চিত্র ১১.১.১৫ : XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

২. XX–XO পদ্ধতি

(ফড়িং, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙ্গ ও Dioscorea শ্রেণির উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ)

ফড়িং, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙ্গে XX–XO পদ্ধতির লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। এখানে স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক অর্থাৎ XX সেক্স-ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। কিন্তু পুরুষে Y ক্রোমোজোম অনুপস্থিত। স্ত্রীর ক্রোমোজোম 2A + XX এবং পুরুষের ক্রোমোজোম 2A + XO (Y না থাকায় 'O' শূন্য লেখা হয়)। স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক, কাজেই সমস্ত ডিম্বাণু একই ধরনের (A + X)। কিন্তু পুরুষে দুধরনের গ্যামেট [(A + X) এবং (A + O)] উৎপন্ন হয়।

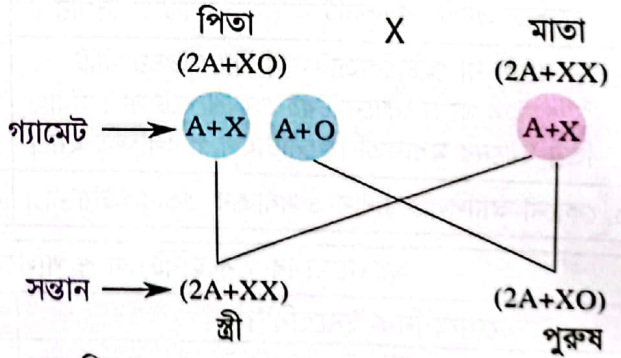

চিত্র ১১.১.১৬ : XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

প্রথম প্রকারের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে স্ত্রী সন্তান (2A + XX), কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে পুরুষ সন্তানের (2A + XO) সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদে সচরাচর এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায় না। তবে *Dioscorea sinuata* উদ্ভিদে এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায়।

CamScanner

সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার (Sex-linked Disorders)

প্রাণীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সেক্স ক্রোমোজোমে উপস্থিত জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেক্স ক্রোমোজোম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এসব বৈশিষ্ট্যকে **সেক্স-লিংকড বৈশিষ্ট্য** (sex linked characters) বলে। এসব বৈশিষ্ট্য সেক্স ক্রোমোজোমের সঞ্চারণ অনুযায়ী বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। **সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্স-লিঙ্কড বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স-লিংকড ইনহেরিট্যান্স** (sex linked inheritance) বলে। মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া যায়। মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতিয় রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের (X ও Y) মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের **সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার বা অস্বাভাবিকতা** বলে। মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত এরকম কয়েকটি রোগ হলো **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা** (Red-green Color Blindness), **হিমোফিলিয়া** (Hemophilia), **ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy)। মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো **কানের লোম**।

লাল সবুজ বর্ণান্ধতা (Red Green Color Blindness)

মানুষের চোখের রেটিনাতে কিছু বর্ণ সংবেদী কোষ আছে যেগুলো বর্ণ শনাক্ত করে। মানুষের X ক্রোমোজোমে দুটি জিন আছে যা বর্ণ সংবেদী কোষ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বর্ণ সংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। ফলে এ প্রচ্ছন্ন জিনবিশিষ্ট মানুষ কতকগুলো বিশেষ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। একে **বর্ণান্ধতা** (color blindness) বলে। **লাল সবুজ বর্ণান্ধতা একটি সেক্স লিঙ্কড রোগ**। এক্ষেত্রে মানুষ লাল সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। **জন ডাল্টন** (John Dalton) নামক একজন বিজ্ঞানী মানুষের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করেন। এজন্য একে **ডাল্টোনিজম** (Daltonism) বলে। বর্ণান্ধতার কোনো চিকিৎসা নেই কিংবা বর্ণান্ধ রোগী কখনোই সুস্থ হয় না। বর্ণান্ধতা শনাক্তকরণ পরীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো **ইশিহারা কালার টেস্ট** (Ishihara Color Test)।

বর্ণান্ধতার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : পুরুষের X ক্রোমোজোমে বর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে পুরুষ বর্ণান্ধ হয় কারণ Y ক্রোমোজোমে এর প্রকট অ্যালিল থাকে না। অপরপক্ষে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোমে প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে স্ত্রী বর্ণান্ধ হয় কিন্তু একটি X ক্রোমোজোমে প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে স্ত্রী বর্ণান্ধ হয় না, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণান্ধতা জিনের বাহক হয়। দৃষ্টির স্বাভাবিক জিন XC এবং বর্ণান্ধতার জিন Xc হলে মানুষের দৃষ্টিশক্তির জিনোটাইপ নিম্নরূপ হবে।

১. স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষ = XCY ২. বর্ণান্ধ পুরুষ = XcY
৩. স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলা = XCXC ৪. বর্ণান্ধ মহিলা = XcXc ৫. বাহক মহিলা = XCXc

বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে : মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির জিন XC এবং বর্ণান্ধতার জিন Xc। তাহলে বর্ণান্ধ পুরুষের জেনোটাইপ হবে XcY ও স্বাভাবিক মহিলার জেনোটাইপ হবে XCXC। বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে F_1 জনুর পুত্র কন্যা সকলেই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই হবে বর্ণান্ধ জিনের বাহক।

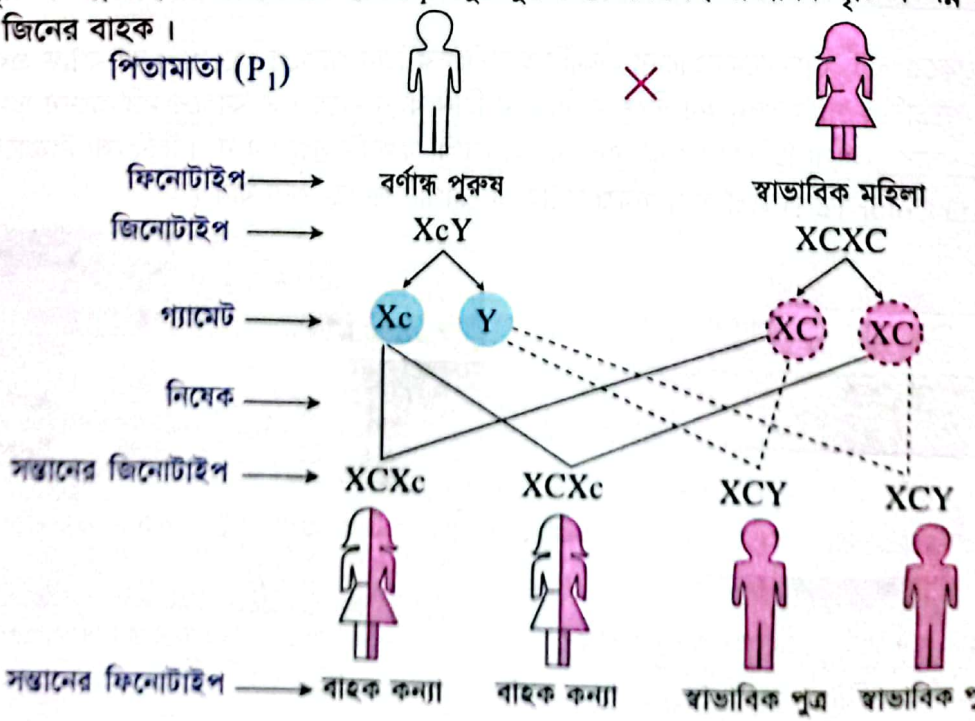

চলমান পাতা

CamScanner

F_1 জনুর সন্তানদের অনুরূপ জিনোটাইপধারী (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের সাথে বর্ণান্ধবাহক মহিলার বিয়ে হলে ঐ মহিলার চার সন্তানের মধ্যে দুজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্ম লাভ করবে।

বর্ণান্ধতা রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটি বংশপরম্পরায় পিতা থেকে কন্যার মাধ্যমে পৌত্রকে আক্রান্ত করে। একে **ক্রিসক্রস ইনহেরিট্যান্স** (criss cross inheritance) বলে।

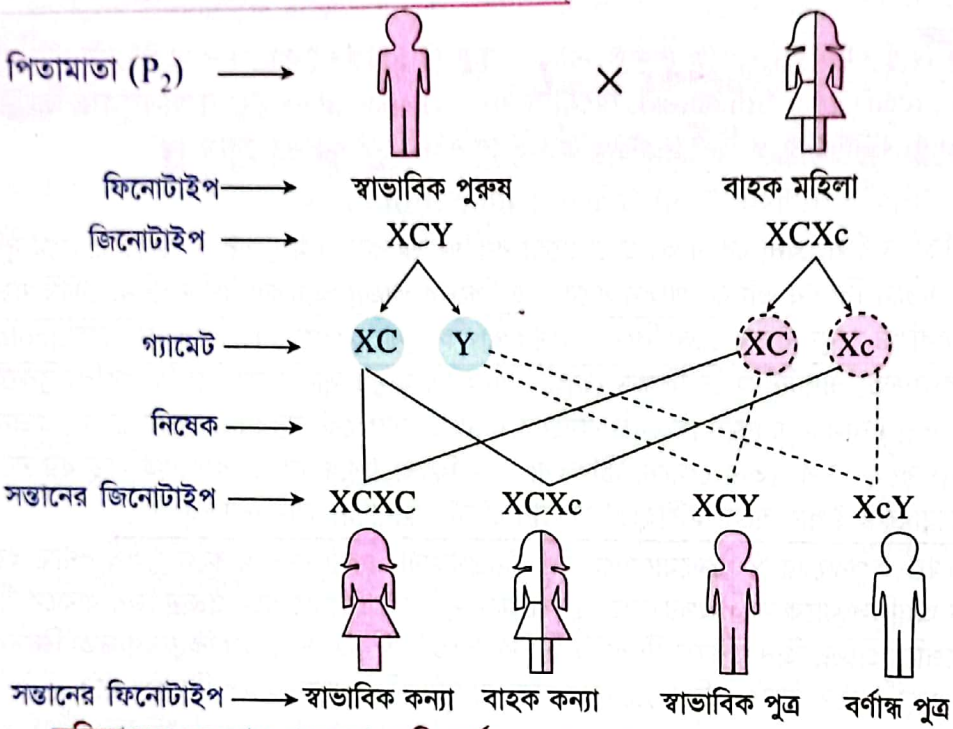

সুতরাং বিয়ের আগে বর্ণান্ধতার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। কারণ রাস্তায় যান চলাচলে লাল ও সবুজ আলো গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পছন্দের ফুল উপহার দিতে কিংবা বাজার থেকে কাঁচা-পাকা ফল বা জামা-কাপড় কিনতেও বর্ণান্ধদের বেশ বিব্রত হতে হয়।

মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হওয়ার কারণ–

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮% পুরুষ এবং ০.৫% মহিলা বর্ণান্ধ। কারণ–

১. বর্ণান্ধতার জিন X ক্রোমোজোমে অবস্থিত ও প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ায় মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় (XcXc) বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায় কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোমে বর্ণান্ধের জিন থাকলেই (XcY) বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায়।

২. মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোমের একটিতে বর্ণান্ধের জিন থাকলে (XCXc) তা বর্ণান্ধ প্রকাশ ঘটাতে পারে না ফলে মহিলা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণান্ধতার জিন বহন করে। এ কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষ বেশি বর্ণান্ধ হয়। বর্ণান্ধতার কোনো চিকিৎসা নেই এবং বর্ণান্ধ রোগী কখনই সুস্থ হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে **ইশিহারা কালার টেস্ট** (Ishihara Color Test) দ্বারা লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগটি শনাক্ত করা যায়।

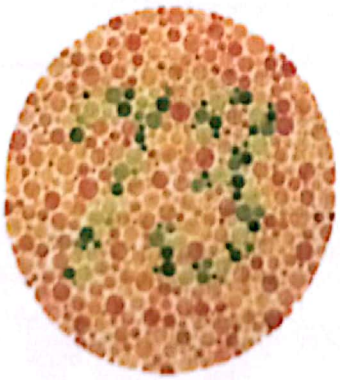

চিত্র ১১.১.১৯ : যদি কেউ 73 সংখ্যাটি পড়তে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে, তিনি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ

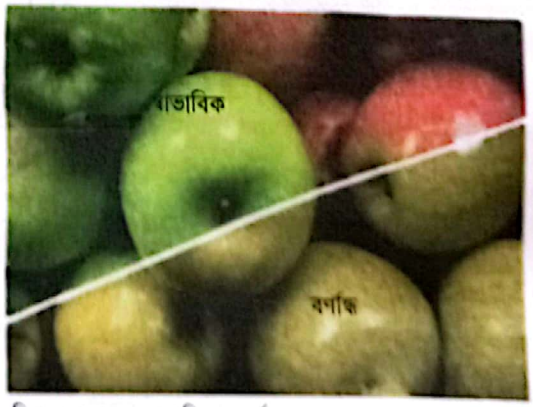

চিত্র ১১.১.২০ : স্বাভাবিক ও বর্ণান্ধ মানুষ যে ভাবে আপেলের রং দেখতে পান

হিমোফিলিয়া (Haemophilia)

হিমোফিলিয়া হচ্ছে বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একপ্রকার রক্ত তঞ্চনঘটিত ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চিত হয় না এবং রক্ত ক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। বর্ণান্ধতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনহানির আশঙ্কা থাকে না কিন্তু হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাও যেতে পারে। X-ক্রোমোজোমের একটি প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিন (mutant gene; প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে পরিব্যক্ত কোন জিন)-এর কারণে হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে। হিমোফিলিয়া নিচে বর্ণিত দুধরনের হয়ে থাকে :

১. ক্লাসিক হিমোফিলিয়া বা হিমোফিলিয়া A (Classic Haemophilia or Haemophilia A) : রক্ততঞ্চনের VIII নম্বর ফ্যাক্টর বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (Antihaemophilic factor) উৎপন্ন না হলে এ রোগটি হয়।

২. খ্রিস্টমাস ডিজিজ বা হিমোফিলিয়া B (Christmas Disease or Haemophilia B): রক্ততঞ্চনের IX নম্বর ফ্যাক্টর বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন কমপোনেন্ট (Plasma thromboplastin component) বা খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর (christmas factor) অনুপস্থিত থাকলে এ রোগটি হয়।

হিমোফিলিয়া রোগে মহিলা অপেক্ষা পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রতি ১০,০০০ জন পুরুষের মধ্যে একজন হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। অধিকাংশ হিমোফিলিক ব্যক্তি হিমোফিলিয়া-A রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত হিমোফিলিক পুরুষ ও মহিলারা ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই রক্তক্ষরণের জন্য মারা যায়। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত **স্বাভাবিক** এবং **হিমোফিলিয়া** অ্যালিল দুটি যথাক্রমে X^H এবং X^h। মহিলারা তিন প্রকার জিনোটাইপ বিশিষ্ট হতে পারে–X^HX^H (সম্পূর্ণ স্বাভাবিক), X^HX^h (স্বাভাবিক কিন্তু বাহক) এবং X^hX^h (হিমোফিলিক)। পুরুষদের ক্ষেত্রে দুধরনের জিনোটাইপ হতে পারে, যেমন–X^HY (স্বাভাবিক) এবং X^hY (হিমোফিলিক)। উল্লেখ্য যে ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চার কন্যার মধ্যে দুই কন্যা **অ্যালিস** ও **বিয়াট্রিশ** হিমোফিলিয়ার বাহক ছিলেন।

হিমোফিলিয়া আক্রান্ত অর্থাৎ হিমোফিলিক পুরুষের সাথে স্বাভাবিক মহিলার বিয়ে হলে কেবল কন্যারা তা বহন করে এবং কন্যার মাধ্যমে পরবর্তীতে তার পুত্রদের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। একজন স্বাভাবিক কিন্তু হিমোফিলিয়া বাহক মহিলার সাথে স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে, সকল কন্যা সন্তান স্বাভাবিক হবে কিন্তু পুত্র সন্তানদের মধ্যে ৫০% হিমোফিলিক হবার সম্ভাবনা থাকে। নিচে উদাহরণসহ দেখানো হলো।

পিতা-মাতা →	স্বাভাবিক পুরুষ	×	স্বাভাবিক কিন্তু বাহক মহিলা
জিনোটাইপ →	X^HY	×	X^HX^h
গ্যামেট →	X^H, Y	×	X^H, X^h

F_1 জনু →

স্ত্রীগ্যামেট / পুংগ্যামেট	X^H	X^h
X^H	X^HX^H (স্বাভাবিক কন্যা)	X^HX^h (স্বাভাবিক কিন্তু বাহক কন্যা)
Y	X^HY (স্বাভাবিক পুত্র)	X^hY (হিমোফিলিক পুত্র)

মানুষের কয়েকটি সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার

সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার	লক্ষণ
১. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা	লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না।
২. হিমোফিলিয়া	রক্ততঞ্চন বিলম্বিত হয়, ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ক্ষরিত হয়।
৩. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি	বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজ কর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
৪. রাতকানা	রাতে কোন কিছু দেখতে পায় না।
৫. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	অস্বাভাবিক মূত্র ত্যাগ, শারীরিক অক্ষমতা।
৬. ফ্রাজাইল X সিনড্রম	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
৭. হাইপারট্রাইকোসিস	সমগ্র দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
৮. টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন	পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।

CamScanner

ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (Duchenne Muscular Dystrophy = DMD)

এটি একটি জিনঘটিত রোগ। একটি সেক্স-লিংকড জিনের বিশৃঙ্খলার কারণে প্রধানত শিশুদেহে প্রকাশিত হাত, পা, দেহকান্ড, হৃৎপিন্ড ও আন্ত্রিক পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজকর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে যে দুর্বিসহ জীবনের সূত্রপাত ঘটায় সেটি হচ্ছে **মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** নামে এ বংশগত রোগ। **অসুখটি ছেলে শিশুদের বেশি হয়।** তিরিশের বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দেখা যায়। এর মধ্যে ৯টি হচ্ছে প্রধান বাকিগুলো দুর্লভ। রোগের সাধারণ শারীরিক লক্ষণগুলো হচ্ছে– পেশির দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাব; স্থূলতা দেখা দেয়া; দ্রুত পেশিক্ষয়, দুর্বলতা ও পেশি অকার্যকর হওয়া; অস্থিসন্ধির কুঞ্চন; কপালের উপরে টাক হওয়া (frontal baldness); চোখে ছানি পড়া; চোখের পাতা ঝুঁকে পড়া; মানসিক অস্বাভাবিকতা; জননাঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতি। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিযুক্ত শিশুদের বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুদের মানসিক উঠা-নামা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তখন সব শিশুর জন্যই কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার দরকার পড়ে না।

নিম্নোক্ত আচরণগত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অভিভাবককে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে :

(i) স্কুলে আচরণগত সমস্যা ও দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করার সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকদের রিপোর্ট। (ii) অভিভাবক বা সেবাদানকারীর উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়া। (iii) মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হাঁটতে না চাওয়া। (iv) অসুখ সম্বন্ধে হতাশ ও আবেগতাড়িত হয়ে পড়া। (v) ঘন ঘন বদমেজাজ দেখানো। (vi) ওষুধ খাওয়া বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপার প্রতিরোধ করা বা এড়িয়ে চলা এবং (vii) নিজের বয়সী শিশুদের কর্মকান্ডে অংশ না নেওয়া বা জমায়েতে অংশগ্রহণ না করা।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি একটি দুর্লভ জিনঘটিত অসুখ। আগেই বলা হয়েছে যে তিরিশেরও বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রয়েছে। এর মধ্যে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy সংক্ষেপে DMD) হচ্ছে ভয়াবহতম ডিস্ট্রফি। পঞ্চাশ হাজারে মাত্র একজনে এ রোগটি দেখা যেতে পারে। অন্য ডিস্ট্রফিগুলো আরও দুর্লভ। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফির সঙ্গে বোধশক্তিজনিত প্রতিক্রিয়ার সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। কোনো শিশু যদি **অনুগ্র মানসিক প্রতিবন্ধী** (mild intellectual disable) বিশিষ্ট হয় এবং মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে তাহলে সে স্বাভাবিক মানুষের মতোই লেখা-পড়া ও চাকুরি করতে পারবে, এমনকি সাধারণ মানুষের মতো যানবাহনে চলাফেরাও করতে পারবে। **মাঝারি** (moderate) ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী হলে ওসব কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কিন্তু **তীব্র** (very) মানসিক প্রতিবন্ধী বিশিষ্ট মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে এমন শিশু **অটিজম** (autism)-এর দিকে ধাবিত হতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, জেনেটিক বিশৃঙ্খলজনিত এ রোগটির কোনো চিকিৎসা নেই। গবেষকরা মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি সৃষ্টিকারী **পরিব্যক্ত** (mutated) জিন সংশোধনের জন্য জেনেটিক থেরাপি আবিষ্কারের উদ্দেশে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। গবেষণার লক্ষ হচ্ছে অস্থিসন্ধির বিকৃতিরোধ করা, সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানো এবং রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত দীর্ঘায়ু করে তোলা। তবে বর্তমানে পেশির দুর্বলতা, আক্ষেপ, কাঠিন্য প্রভৃতি উপশমে বিভিন্ন ওষুধের প্রচলন রয়েছে (যেমন মেক্সিলেটিন, ব্যাকলোফেন, কার্বঅ্যামেজপাইন ইত্যাদি)।

X ক্রোমোজোমে অবস্থিত কোনো জিন যদি পরিব্যক্ত হয়ে অপত্য বংশে সঞ্চারিত হয় এবং রোগের প্রকাশ ঘটায় তবে সে ব্যক্তিকে X-লিংকড ব্যাধি নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষে যেহেতু একটিমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে তাই এসব রোগ-ব্যাধি কেবল পুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরুষে আরেকটি X ক্রোমোজোমের পরিবর্তে যেহেতু Y ক্রোমোজোম থাকে তাই মাসুক্যুলার ডিস্ট্রফির জন্য দায়ী **ডিস্ট্রফিন জিন**-এর আর কপি থাকে না।

নারীদেহে দুটি X ক্রোমোজোম (XX) থাকে। অতএব একটি X ক্রোমোজোমের জিন বিকৃত হলে অন্য X ক্রোমোজোমে অবস্থিত স্বাভাবিক জিনটি **ব্যাকআপ কপি** হিসেবে কাজ করে। নারী পরিব্যক্ত X-লিংকড জিন বহন করলেও তার দেহে X-লিংকড রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাবে না, তবে ঐ নারী রোগের বাহক হিসেবে কাজ করবে এবং ওই জিন তার পুত্র-সন্তানে সঞ্চারিত করবে। প্রত্যেক পুত্র সন্তান অস্বাভাবিক এ জিন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার ৫০% ঝুঁকি বহন করে। কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার সূত্রে বহন এবং রোগের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালনের ঝুঁকি থাকবে ৫০%।

X ক্রোমোজোমে স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি (mutation)-র ফলে পুত্র সন্তানে X-লিংকড প্রচ্ছন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

CamScanner

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে জিনের ভূমিকা : দেহে প্রায় ৩ হাজার পেশি-প্রোটিন রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রোটিন একেকটি জিন-এ রক্ষিত থাকে। কিছু পেশি-প্রোটিন পেশিতন্তুর গাঠনিক অংশ, অন্যগুলো পেশিতন্তুতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একটি পেশি-প্রোটিন জিনে সামান্য বিকৃতিও পেশিরোগের প্রকৃতি ও ভয়াবহতাকে প্রভাবিত করে। যেমন-**ডিস্ট্রফিন** প্রোটিন উৎপন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র পেশি-ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের অবস্থাকে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** বলে। আবিষ্কারক ফরাসি স্নায়ু বিশেষজ্ঞ **গিলাওমি বেনজামিন অ্যামান্ড ডুশেনি** (Guillaume Benjamin Amand Duchenne, 1806-1875) এর নামানুসারে রোগের নামকরণ করা হয়। অন্য ক্ষেত্রে হয়তো রোগের অবস্থা তেমন ব্যাপক হয় না। আবার অন্যান্য ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ডিস্ট্রফিন জিনে নয় বরং অন্যান্য জিনে মিউটেশন (পরিব্যক্তি) ঘটতে দেখা যায়।

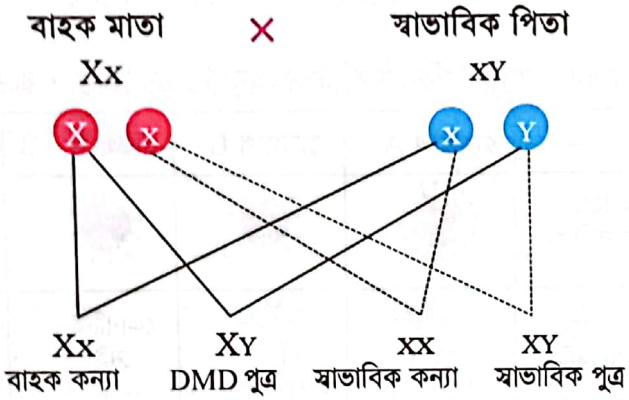

X = রোগের জিনবাহী x ক্রোমোজোম

x = স্বাভাবিক x ক্রোমোজোম

Y = Y ক্রোমোজোম

ABO ব্লাডগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টর-এর কারণে সৃষ্ট সমস্যা
(ABO Blood Group and Problems due to Rh Factor)

ABO ব্লাডগ্রুপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ফ্রান্সে ও পরে ইংল্যান্ডে মানুষ থেকে মানুষে রক্তদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্রহীতা অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো। মানবদেহের বাইরে দাতা ও গ্রহীতার রক্ত মিশ্রিত করে দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে না মিশে কণিকাগুলো পরস্পর জড়িয়ে (coagulate) যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দাতা গ্রহীতার উভয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়। অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তের লোহিত কণিকায় A ও B নামে দুধরনের অ্যান্টিজেন এবং রক্তরসে α ও β নামে দুধরনের অ্যান্টিবডি থাকে।

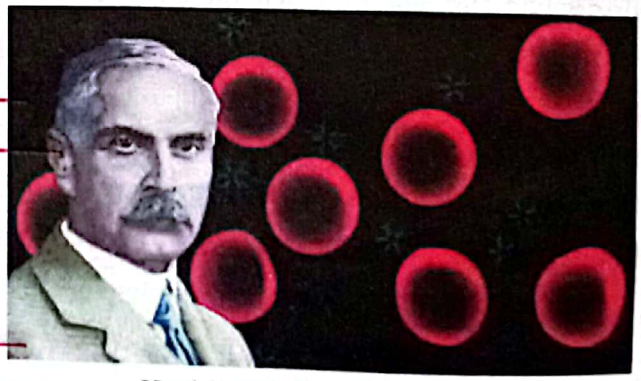
Karl Landsteiner (1868-1943)

লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে অ্যান্টিজেন-A ও B এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিভাগ করেন, তাকে **ABO ব্লাডগ্রুপ** বা সংক্ষেপে **ব্লাডগ্রুপ** বলে। ব্লাডগ্রুপ আবিষ্কারের জন্য কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান।

মানবদেহে প্রায় ৪০০ ধরনের অ্যান্টিজেন আছে। এদের মধ্যে মাত্র ৩০টি সম্বন্ধে জানা গেছে। এসব অ্যান্টিজেনের উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রায় ২১টি ব্লাডগ্রুপ রয়েছে। তবে রক্ত সঞ্চারণের (blood transfusion) ক্ষেত্রে সকল ব্লাডগ্রুপ গুরুত্ব বহন করে না। কেবল ABO ও Rh ধরনের ব্লাডগ্রুপ রক্ত সঞ্চারণের গুরুত্ব বহন করে।

CamScanner

মানুষের লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী দুধরনের **অ্যান্টিজেন** এবং রক্তরসে ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী দুধরনের স্বতঃস্ফূর্ত **অ্যান্টিবডি** থাকে। ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী অ্যান্টিজেনগুলো মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ এবং **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (agglutinogen) নামে পরিচিত। অপরপক্ষে, ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী অ্যান্টিবডিগুলো গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ এবং **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) নামে পরিচিত। ল্যান্ডস্টেইনার এ অ্যান্টিজেনগুলোর নাম দেন **অ্যান্টিজেন-A** ও **অ্যান্টিজেন-B** এবং অ্যান্টিবডিগুলোর নাম দেন **অ্যান্টিবডি-A** বা α এবং **অ্যান্টিবডি-B** বা β। এসব অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির ভিত্তিতে তিনি মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করেন, যথা-A, B, AB ও O গ্রুপ।

১. **ব্লাডগ্রুপ–A** : A ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে অ্যান্টিজেন-A এবং রক্তরসে অ্যান্টিবডি-B থাকে। A গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। A ব্লাডগ্রুপের দাতা A ও AB ব্লাডগ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে এবং A ও O গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। মানবজাতির প্রায় ২৩% ব্যক্তি A ব্লাডগ্রুপের অধিকারী।

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের চারটি গ্রুপ

	ব্লাডগ্রুপ A	ব্লাডগ্রুপ B	ব্লাডগ্রুপ AB	ব্লাডগ্রুপ O
লোহিত রক্ত কণিকা			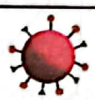	
প্লাজমাতে অ্যান্টিবডি	অ্যান্টিবডি β	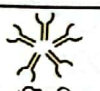 অ্যান্টিবডি α	কোনটিই নেই	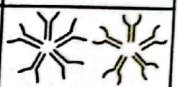 অ্যান্টিবডি α ও অ্যান্টিবডি β
লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	A অ্যান্টিজেন	B অ্যান্টিজেন	A ও B অ্যান্টিজেন	A ও B কোন অ্যান্টিজেন নেই

২. **ব্লাডগ্রুপ-B** : B ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে অ্যান্টিজেন-B এবং রক্তরসে অ্যান্টিবডি-A থাকে। B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। B ব্লাডগ্রুপের দাতা B ও AB ব্লাড গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে এবং B ও O গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। মানবজাতির প্রায় ৩২% ব্যক্তি B ব্লাডগ্রুপের অধিকারী।

৩. **ব্লাডগ্রুপ-AB** : AB ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে অ্যান্টিজেন-A ও B উভয়ই থাকে, কিন্তু রক্তরসে ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না। AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না, কারণ তাতে অ্যান্টিবডি-A বা B নেই। AB ব্লাডগ্রুপের দাতা শুধু AB ব্লাডগ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে এবং সব গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। এজন্য **AB ব্লাডগ্রুপের ব্যক্তিকে সার্বজনীন গ্রহীতা** (universal recipient) **বলা হয়**। মানবজাতির প্রায় ৮% ব্যক্তি AB ব্লাডগ্রুপের অধিকারী।

৪. **ব্লাডগ্রুপ-O** : O ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে ব্লাডগ্রুপ নির্ধারণকারী কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, কিন্তু রক্তরসে অ্যান্টিবডি–A ও B উভয়ই থাকে। O গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য তিনটি গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। O ব্লাডগ্রুপের দাতা সকল ব্লাডগ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে এবং শুধু O ব্লাডগ্রুপের রক্ত নিতে পারে। এজন্য **O ব্লাডগ্রুপের ব্যক্তিকে সার্বজনীন দাতা** (universal donor) **বলা হয়**। মানবজাতির প্রায় ৩৭% ব্যক্তি O ব্লাডগ্রুপের অধিকারী। [O এসেছে জার্মান শব্দ *ohne* যার অর্থ শূন্য (without) থেকে।

[অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

ABO ব্লাডগ্রুপের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (Genetical Explanation of ABO Blood Group)

বিজ্ঞানী **বার্ণস্টেইন** (Bernstein, 1925) প্রমাণ করেন যে, মানুষের ABO ব্লাডগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিনের তিনটি অ্যালিল রয়েছে, যথা–L^A, L^B ও L^o। এরা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থান করে এবং একই বৈশিষ্ট্য (ব্লাডগ্রুপ) নিয়ন্ত্রণ করে। একটি জিনের দুইয়ের অধিক অ্যালিল থাকলে তাদেরকে **মালটিপল অ্যালিল** (multiple allele) বলে। আর মালটিপল অ্যালিল নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতিকে **মালটিপল অ্যালিলিজম** (multiple

allelism) বলা হয়। মানুষের ABO ব্লাডগ্রুপ মালটিপল অ্যালিলিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্লাডগ্রুপ আবিষ্কারক Landsteiner এর নামের প্রথম অক্ষর L দ্বারা ব্লাডগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিনকে চিহ্নিত করা হয়। একজন মানুষের একটি দেহকোষে (somatic cell) উক্ত জিনের যে কোনো দুটি অ্যালিল থাকে। L^A ও L^B অ্যালিল দুটি লোহিত কণিকায় যথাক্রমে অ্যান্টিজেন-A ও অ্যান্টিজেন-B সৃষ্টির জন্য দায়ী। L^o অ্যালিল কোনো অ্যান্টিজেন সৃষ্টি করে না। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অ্যালিল L^A ও L^B উভয়েই অ্যালিল L^o এর উপর প্রকট এবং অ্যালিল L^A ও L^B পরস্পরের উপর সমপ্রকট (codominant)। সুতরাং ABO ব্লাডগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিনের অ্যালিলিক সিরিজের প্রকট-প্রচ্ছন্নতার সম্পর্ক হলো: $L^A = L^B > L^o$

মানুষের বিভিন্ন ABO ব্লাডগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলসমূহের জিনোটাইপিক বিন্যাস নিম্নরূপ

ব্লাডগ্রুপ	জিনোটাইপ	
	বিশুদ্ধ	সংকর
A	L^AL^A	L^AL^o
B	L^BL^B	L^BL^o
AB	---	L^AL^B (সমপ্রকটতা)
O	L^oL^o	---

Rh ফ্যাক্টর

১৯৪০ সালে **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** এবং **উইনার** (Karl Landsteiner and Wiener) **রেসাস** বানরের *(Macaca mulatta)* রক্ত খরগোসের শরীরে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের রক্তরসে এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হন। এ ফলাফল থেকে বিজ্ঞানী দুজন ধারণা করেন যে, মানুষের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার অ্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের নাম অনুসারে ঐ অ্যান্টিজেনকে **রেসাস ফ্যাক্টর** (Rhesus factor) বা সংক্ষেপে Rh factor বলে।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে **Rh ব্লাড গ্রুপ** বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে Rh^+ (Rh পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে Rh^- (Rh নেগেটিভ) রক্ত বলে।

বিজ্ঞানী Fisher মত প্রকাশ করেন যে, Rh ফ্যাক্টর মোট ৬টি সাধারণ অ্যান্টিজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন-C, c; D, d; E, e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রকট** এবং c, d, e হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রচ্ছন্ন**। মানুষের লোহিত কণিকায় এক সংগে ৩টি অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন-CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, CDd অসম্ভব। মেন্ডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন (C, D, E) যে রক্তে থাকে তাকে Rh^+ রক্ত বলে। যে রক্তে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন (c, d, e) থাকে তাকে Rh^- রক্ত বলে।

বিভিন্ন ব্লাডগ্রুপের বৈশিষ্ট্য		
ব্লাডগ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A^+	A^+, AB^+	A^+, A^-, O^+, O^-
B^+	B^+, AB^+	B^+, B^-, O^+, O^-
AB^+	AB^+	সব গ্রুপের
O^+	O^+, A^+, B^+, AB^+	O^+, O^-
A^-	A^+, A^-, AB^+, AB^-	A^-, O^-
B^-	B^+, B^-, AB^+, AB^-	B^-, O^-
AB^-	AB^+, AB^-	AB^-, A^-, B^-, O^-
O^-	সব গ্রুপকে	O^-

CamScanner

১. রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা (Complexity in Blood Transfusion) : Rh^- রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির রক্তে Rh^+ বিশিষ্ট রক্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কিন্তু গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ Rh^+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। এই অ্যান্টিবডিকে **অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর** বলে।

গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার দাতার Rh^+ রক্ত গ্রহণ করে তা হলে গ্রহীতার রক্তরসের অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টরের প্রভাবে দাতার লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে পিন্ডে পরিণত হবে। তবে একবার সঞ্চারণের পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তা হলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

২. গর্ভধারণজনিত জটিলতা (Complexity in Pregnancy) : সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন Rh^- (Rh নেগেটিভ) মহিলার সঙ্গে Rh^+ (Rh পজিটিভ) পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে Rh^+, কারণ Rh^+ একটি প্রকট বিশিষ্ট। ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের Rh^+ ফ্যাক্টরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রক্ত Rh^- হওয়ায় তার রক্তরসে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর (অ্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে।

অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করলে ভ্রূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস

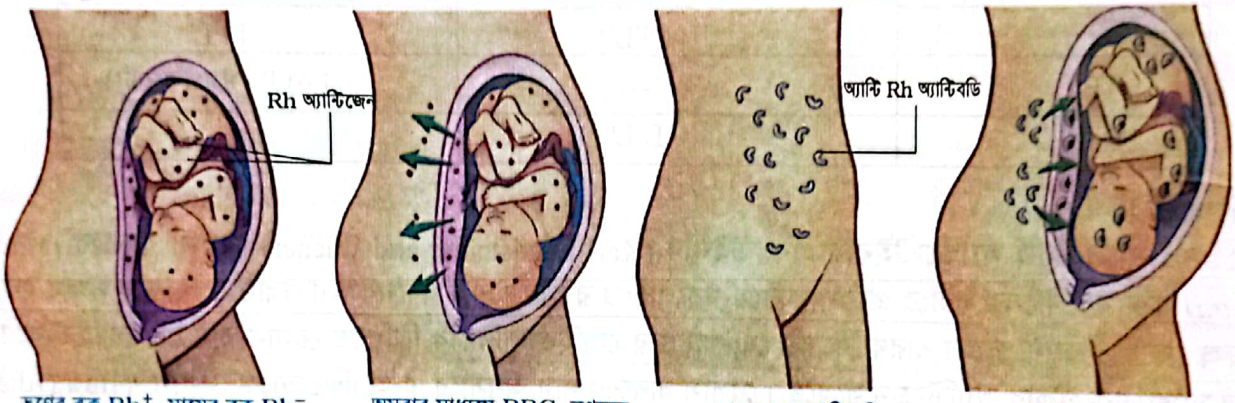

চিত্র ১১.১.২৪ : Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা

করে, ভ্রূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচন্ড রক্তাল্পতা এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** (erythroblastosis fetalis) বলে।

যেহেতু Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থই জন্মায়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভাধান থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং ভ্রূণ এ রোগে ভুগে মারা যায়। তাই বিয়ের আগে হবু বর-কনের রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh^+ নয়তো, Rh^-) দম্পতি হওয়া উচিত। তবে সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশে Rh^- বৈশিষ্ট্য দুর্লভ।

Rh-জনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায় : চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বর্তমানে **অ্যান্টি-D** নামে **অ্যান্টিরেসাস অ্যান্টিবডি** আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম শিশু জন্মের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই অ্যান্টিবডি Rh^- ব্লাডগ্রুপের মাতার দেহে শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করালে মাতার দেহের Rh অ্যান্টিজেন বিরোধী Rh অ্যান্টিবডির কার্যকারিতা লোপ পায়। ফলে Rh^- মাতা নির্বিঘ্নে পরবর্তী সন্তান জন্ম দিতে পারেন।

ব্লাডগ্রুপ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা : নিম্নলিখিত কারণে মানুষের ব্লাডগ্রুপ নির্ণয় অত্যন্ত জরুরী–

(i) রক্তপাত, রক্তাল্পতা বা শল্যচিকিৎসার কারণে কারও দেহে রক্তের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমে গেলে সঠিক রক্তদানের জন্য ব্লাডগ্রুপ নির্ণয় দরকার। (ii) ABO অ্যান্টিজেন দেহের টিস্যুতে ব্যাপকবিস্তৃত, তাই বৃক্ক প্রভৃতি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের আগে দাতা ও গ্রহীতার ব্লাডগ্রুপ সঠিকভাবে জেনে নিতে হয়। (iii) **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** প্রতিরোধে ব্লাডগ্রুপ জেনে বিয়ে করতে হয়। (iv) দোষ বা নির্দোষ প্রমাণের জন্য। (v) জাতিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য। (vi) পিতৃত্ব পরীক্ষার জন্য।

CamScanner

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতামাতা থেকে বংশাণুক্রমে সন্তান সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বংশগতি বা হেরিডিটি বলে।

২. জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের বংশগতি ও প্রকরণের রীতিনীতি অর্থাৎ বংশাণুক্রমিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি এবং এসব বৈশিষ্ট্যের বাহক জেনেটিক বস্তু তথা জিনের রাসায়নিক গঠন, প্রকরণ, মিউটেশন, পারস্পরিক ক্রিয়া, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা Genetics বা কৌলিতত্ত্ব বলে।

৩. মেন্ডেলের সূত্র বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তাকে মেন্ডেল তত্ত্ব বা মেন্ডেলিজম বলে।

৪. সাটন ও বোভেরি বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন চরিত্র নির্ধারক জিনগুলো ক্রোমোজোমের উপরে অবস্থান করে এবং ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জিনগুলো পরবর্তী জনুতে সঞ্চারণ ঘটার দরুণ বংশপরম্পরায় পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

৫. যেসব জিনের উপস্থিতিতে জীবের মৃত্যু ঘটে তাকে লিথাল জিন বা মারণ জিন বলে। এর অনুপাত ২ ঃ ১।

৬. সাধারণ অবস্থায় একটি প্রকট অ্যালিল এর প্রচ্ছন্ন অ্যালিলকে অপ্রকাশিত রাখে। কিন্তু যখন একটি জিন এর অ্যালিল নয় এরূপ জিনকে অপ্রকাশিত রাখে তখন এ ঘটনাকে এপিস্ট্যাসিস বলে। এর অনুপাত ১৩ ঃ ৩।

৭. বংশগতির যেসব ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমের বিভিন্ন লোকাসে (নন অ্যালিলিক) অবস্থিত দুই এর অধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিমাপ দ্বারা যাদের মাত্রা নির্ণয় করা হয় তাদের পলিজেনিক ইনহ্যারিট্যান্স বা বহুজিনিয় বংশগতি বলে। মানুষের গাত্রবর্ণ, ওজন ইত্যাদি পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৮. যে প্রক্রিয়ায় জীবের পরিস্ফুটনের শুরুতে অর্থাৎ নিষেককালে অপত্যে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বলে।

৯. যে বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম কোনো জীবে লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে। সেক্স ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোম নামেই পরিচিত।

১০. সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্সলিংকড বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স বা লিঙ্গ জড়িত বংশগতি বলে।

১১. মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতি রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা বলে। মানুষের লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতাগুলো হলো–

* লাল সবুজ বর্ণান্ধতা– লাল ও সবুজ রংয়ের পার্থক্য বুঝতে পারে না।
* হিমোফিলিয়া– রক্ত তঞ্চন বিলম্বিত হয় ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ক্ষরণ ঘটে ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।
* ডুশিনি মাসকুলার ডিস্ট্রফি (DMD)- পেশি শক্ত হয়ে যায়। ১০ বছর বয়সে হাটাচলা করতে পারে না, ২০ বছর বয়সের মধ্যে মারা যায়।
* রাতকানা- রাতে কোন কিছু দেখতে পায় না।
* টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন- পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।
* ফ্রাজাইল x সিনড্রোম– অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যতা দেখা দেয়।
* হাইপারট্রাইকোসিস– সমগ্র দেহ লোমে আবৃত থাকে।
* ডায়াবেটিস ইনসিডিডাস– ঘনঘন মূত্র ত্যাগ, শারীরিক অক্ষমতা দেখা দেয়।

১২. লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ব্লাডগ্রুপ বা ABO ব্লাডগ্রুপ বলে।

১৩. Landsteiner ও Wiener (1940) মানুষের রক্তে এক প্রকার অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি লক্ষ করেন, যা রেসাস বানরের রক্তে পাওয়া যায়। মানুষের রক্তে বর্তমান এ প্রকার অ্যান্টিজেনকে Rhesus ফ্যাক্টর, সংক্ষেপে Rh ফ্যাক্টর বলে।

CamScanner

১১.২ : বিবর্তন বা অভিব্যক্তি (Evolution)

বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা (The Concept of Evolution)

বিশাল পৃথিবীর বুকে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমারোহ দেখা যায় তারা ইতোপূর্বে বিদ্যমান সরল প্রকৃতির জীব থেকে ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে– এ ধারণাকে **জৈব বিবর্তন বাদ** (the theory of organic evolution) বলে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে পৃথিবীর উদ্ভব ঘটে। উৎপত্তির প্রথম অবস্থায় এটি একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডবিশেষ ছিল এবং তাই বিকিরণের ফলে ধীরে ধীরে শীতল হয় এবং জলীয় বাষ্প হতে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ হতে বৃষ্টিপাতের ফলে কালক্রমে জলভাগগুলোর সৃষ্টি হয়। মেঘাচ্ছন্ন এই অবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো পেয়ে পানিতে বিদ্যমান অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে আকস্মিকভাবে **প্রোটোপ্লাজম** এর উদ্ভব ঘটে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরবর্তী বহু বছরে পরিবেশের আরও পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে এই প্রোটোপ্লাজম থেকে প্রথমে এককোষী উদ্ভিদ ও পরে কতকগুলো উদ্ভিদের দেহ থেকে **মিউটেশন** (mutation) এর ফলে ক্লোরোফিল বিনষ্ট হয়ে প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। ক্রমান্বয়ে এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পরিণত হয় এবং এদের ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়।

পূর্ব থেকে বিদ্যমান এমন সরল জীব পরিবেশের সাথে অনুকূলতা রক্ষাকল্পে ধীরগতিতে সার্বক্ষণিকভাবে দৈহিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে নতুন জীবে রূপান্তরিত হওয়াকে জৈব বিবর্তন বা অভিব্যক্তি (organic evolution) **বলে**। বিবর্তনের ইংরেজী Evolution শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ল্যাটিন শব্দ "evolvere" অর্থ **বিকশিত হওয়া বা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়া** শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

জীবজগতে যে বিবর্তন ঘটছে এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে বহু আগেই। কিন্তু ঠিক কীভাবে বিবর্তন হচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া যা সহজে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায় না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। কয়েকজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক তাঁদের লেখায় বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু কাল্পনিক ধারণা রেখে গেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বিবর্তনের ফলেই নতুন নতুন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনের ধারণা আধুনিককালের হলেও দেখা যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। **এম্পেডোক্লিস** (Empedocles, 495–435 B.C)-কে **বিবর্তনের জনক বলে** অভিহিত করা হয়। যোগ্যতমের আকস্মিক সৃষ্টি এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি সম্বন্ধে তিনি জোরালো ধারণা পোষণ করতেন। **ডেমোক্রিটাস** (Democritus, 460–357 B.C.) এ ধারণা পোষণ করতেন যে শরীরের যে কোন অঙ্গ পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়। বিখ্যাত দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384-322 B.C)-এর মনেও এ ধারণা জন্মেছিল যে নিম্নস্তরের জীব কতকগুলো ধারাবাহিক নিয়মের মধ্য দিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। অ্যারিস্টটলের পরে ফরাসি বিজ্ঞানী **বুফোন** (Buffon, 1707-1788) মত প্রকাশ করেন যে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবেরও পরিবর্তন হচ্ছে।

বিবর্তনের ধাপসমূহ

বিবর্তনে নিচে বর্ণিত তিনটি ধাপ পরিলক্ষিত হয়–

১. **মাইক্রো-বিবর্তন (Micro-evolution) :** পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (mutation), প্রকরণ (variation) ইত্যাদির ফলে জিন (gene)-এ সংঘটিত পরিবর্তনগুলো এ ধরনের বিবর্তন সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন জাত (race), ভ্যারাইটি বা উপপ্রজাতির সৃষ্টি হয়।

২. **ম্যাক্রো-বিবর্তন (Macro-evolution) :** উপপ্রজাতির ধাপ অতিক্রম করে প্রজাতি সৃষ্টির বিবর্তনকে বলা হয় **ম্যাক্রো-বিবর্তন**।

৩. মেগা-বিবর্তন (Mega-evolution) : পরিব্যক্তির ফলে অনেক সময় ধরে, বৃহৎ পরিসরে সংঘটিত পরিবর্তন, যার ফলে মেজর ট্যাক্সাগুলো (গোত্র, বর্গ, শ্রেণি ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়।

বিবর্তনের ধরণ

জীবের আবাসস্থলের বৈচিত্র্য এবং অভিযোজনিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিবর্তন তিন ধরনের–

১. অভিসারী বিবর্তন (Convergent evolution) : দূর সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী একই পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে অভিযোজনের কারণে তাদের দেহে সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মাধ্যমে এ বিবর্তন ঘটে।

২. অপসারী বিবর্তন (Divergent evolution) : নিকট সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হয়ে বিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

৩. সমান্তরাল বিবর্তন (Parallel evolution) : দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর দুটি দূরবর্তী কিন্তু একই পরিবেশে বসবাস ও অভিযোজনের মাধ্যমে যখন একইভাবে বিবর্তিত হয়।

বিবর্তনের মতবাদসমূহ (Theories of Evolution)

বিবর্তনের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়ার পর দ্বিতীয় যে প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে পড়ে তা হচ্ছে বিবর্তনের **পদ্ধতি** অর্থাৎ **কিভাবে বিবর্তন ঘটে**। এ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত হয়েছে।

- ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কের **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ** (Theory of Inheritance of Acquired Characters)
- ডারউইনিজম বা ডারউইনের **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** (Theory of Natural Section)
- নিও-ডারউইনিজম বা **আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ** (Modern Synthesis Theory or Neodarwinism)
- অগাস্ট ভাইজম্যানের **জার্মপ্লাজম মতবাদ** (Germplasm Theory of August Weismann) এবং
- দ্য ভ্রিসের **পরিব্যক্তি মতবাদ** (Mutation Theory of Hugo de Vries)।

নিচে জৈব বিবর্তনের প্রধান দুটি মতবাদ, **ল্যার্মাকবাদ** ও **ডারউইনবাদ** এবং **নব্য-ডারউইনবাদ** সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কবাদ বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ (Lamarckism or Theory of Inheritance of Acquired Characters)

ল্যামার্ক একজন ফরাসী দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম **জাঁ বাপ্টিস্ট পিয়েরে এন্টোইনে দ্য মনেট শেফালিয়ের দ্য ল্যামার্ক** (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. 1744-1829)। প্রথমে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তারপর উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রাণীর উপর গবেষণা করেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন। তিনি বায়োলজি (Biology) শব্দের প্রবর্তক এবং প্রাণিজগতকে **মেরুদন্ডী** ও **অমেরুদন্ডী** এ দুভাগে বিভক্ত করেন। একটি সুসংগঠিত জৈব বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে ল্যামার্ক সুপরিচিত। তাঁর মতবাদটি, **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ** নামে অভিহিত।

J.B. Lamarck

ল্যামার্ক-এর সূত্রসমূহ

ডডসন (Dodson) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিবর্তন সম্বন্ধে ল্যামার্ক-এর বিস্তৃত ধারণাকে ৪টি সূত্রের অধীন করে ব্যাখ্যার সুবিধা করে দেন। নিচে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রথম সূত্র-বৃদ্ধি : প্রত্যেক জীব তার জীবনকালে অন্তঃজীবনীশক্তির প্রভাবে দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটাতে চায়।

CamScanner

খ. দ্বিতীয় সূত্র-**পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন** : সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সৃষ্ট অভাববোধের উদ্দীপনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে দেহের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে।

গ. তৃতীয় সূত্র-**ব্যবহার ও অব্যবহার** : ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দেহের একটি বিশেষ অঙ্গ সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হতে পারে, আবার অব্যবহারে অঙ্গটি ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঘ. চতুর্থ সূত্র-**অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার** : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্ক-এর সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা

ক. বৃদ্ধি (Tendency to Increase in Size) : জীবের জীবদ্দশায় অন্তঃজীবনীশক্তির প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়েরই বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ লক্ষ করলেও এ সত্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন-Cnidaria থেকে Chordata পর্যন্ত প্রাণিগোষ্ঠির প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায় দেহাকৃতি বৃদ্ধির একটি সাধারণ প্রবণতা।

খ. পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন (Environmental Effect and New Structures or Organs result from New Needs) : পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয় বা অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

ল্যামার্ক মনে করতেন, পরিবেশ উদ্ভিদকে সরাসরি প্রভাবিত করে ফলে নতুন পরিবেশে দেখা দেয় উদ্ভিদের নতুন অঙ্গ। প্রাণীর বেলায় পরিবেশ প্রাণিদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত করে, তখন প্রাণী যা চায় তাই পায়। যেমন-জিরাফের স্নায়ুতন্ত্রই তাকে বাধ্য করেছে ঘাড় উঁচু করে গাছের পাতা খাওয়ার জন্য।

গ. ব্যবহার ও অব্যবহার (The Use and Disuse of Parts) : পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য নতুন সৃষ্ট বা পরিবর্তিত অঙ্গটি যদি জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয় তা হলে তা সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হবে। অন্যদিকে, জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে অঙ্গটির অব্যবহারে তা ক্রমশ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ছোট হতে থাকে, অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিচে ব্যবহার ও অব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হলো।

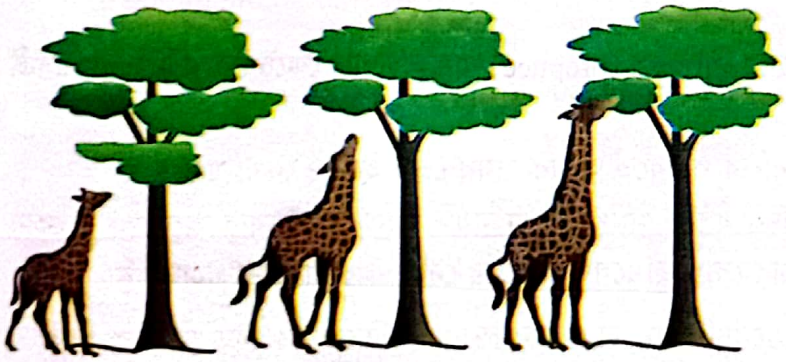

চিত্র ১১.২.২ : জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা

ব্যবহার : (i) জিরাফের আদি পুরুষের গলা ও সামনের পা দুটি এখনকার ঘোড়ার মত খাটো ছিল এবং এরা ঘাস বা ছোট ছোট গাছ আহার করতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে চারণভূমির অভাব ঘটলে এরা গাছের উঁচু শাখা-প্রশাখার পাতা খেতে শুরু করে। উঁচু ডাল-পালা থেকে পাতা খাওয়ার জন্য সৃষ্ট ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গলার দৈর্ঘ্য বংশ পরম্পরায় একটু করে বাড়তে থাকে। এভাবে খাটো গ্রীবাধারী পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান যুগের লম্বা গ্রীবাধারী জিরাফের উদ্ভব ঘটেছে। (ii) হাঁস, পেলিকান, হাড়গিলা প্রভৃতি পাখি আদিকালে স্থলচর ছিল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য পানিতে সাঁতারের প্রয়োজনে পায়ের অধিক ব্যবহারের ফলে পায়ের আঙ্গুলের গোড়া থেকে চামড়া বৃদ্ধি পেয়ে **লিপ্তপদ** (webbeed feet) বিশিষ্ট পাখির উদ্ভব ঘটায়।

অব্যবহার : (i) উটপাখির পূর্ব পুরুষেরা আগে উড়তে পারত। কিন্তু ওদের ডানাদুটি ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে। (ii) মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে **কক্সিক্স** (coccyx)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

CamScanner

ঘ. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার (The Inheritance of Acquired Characteristics) : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হবে। এভাবে, বংশ পরম্পরায় পরিবর্তিত চরিত্র সঞ্চারিত হতে থাকে এবং নতুন নতুন পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে থাকে। ফলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি প্রজাতির সদস্যদের সাথে এদের পূর্বপুরুষের আর তেমন মিল থাকে না। অর্থাৎ উদ্ভব ঘটে এক নতুন প্রজাতির।

ল্যামার্কিজমের সমালোচনা বা ত্রুটিসমূহ

ল্যামার্কবাদের/ল্যামার্কিজমের ত্রুটি বিদ্যুতির কারণে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। তুলনামূলকভাবে ১ম ও ৪র্থ নং প্রতিপাদ্য বিষয় বা সূত্র অর্থাৎ **অন্তঃজীবনী শক্তি জীবের আকার বৃদ্ধি করতে চায় ও অর্জিত গুণাবলীর উত্তরাধিকার** অধিক সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

ডডসন, পলক্যামারার, ম্যাকডোগাল প্রমুখ বিজ্ঞানী ল্যামার্কের মতবাদকে সমর্থন করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। এরা **নিও-ল্যামার্কীয়ান** (neo-lamarckian) বা **নব্য-ল্যামার্কবাদী** নামে পরিচিত। তাদের ধারণাকে **নিও ল্যামার্কীজম** (neo-lamarckism) বলে অভিহিত করা হয়।

পরবর্তীকালে ল্যামার্ক এর মতবাদের বিপক্ষে যে তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. ক্রমাগত ব্যবহারে সুগঠিত পেশির অধিকারী কোনো ব্যায়ামবিদের সন্তান শক্তিশালী পেশির অধিকারী হবে এর কোনো কারণ নেই।

২. **অগাস্ট ভাইজম্যান** (August Weismann, 1834-1914) নামক একজন জার্মান বিজ্ঞানী **ইঁদুর** নিয়ে গবেষণাকালে কিছু পুরুষ ও স্ত্রী ইঁদুরের লেজ কেটে বাক্সে ছেড়ে দেন। এদের মিলনে যেসব ইঁদুর জন্মে তাদের সবগুলোর লেজ ছিল স্বাভাবিক। এরূপে ২২ প্রজন্ম (generation) পর্যন্ত ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা চালানো শেষে তিনি দেখেন যে, কাটা লেজবিশিষ্ট কোন ইঁদুরই জন্মায়না। এভাবে তিনি ল্যামার্কের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন।

৩. **পেইন** (Payne) ড্রসোফিলা (*Drosophila*) মাছি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ৭৫টি প্রজন্ম ধরে চারদিকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লালন পালন করার পরেও তাদের বাচ্চাগুলো অন্ধ হয়ে জন্মায় না।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে মহিলাগণ দীর্ঘ দিন থেকে কান ও নাক ছিদ্র করে আসছেন। কিন্তু তাদের কোনো সন্তানই ছিদ্রযুক্ত কান ও নাক নিয়ে জন্মায় না।

৫. মুসলমান ও ইহুদী বালকদের লিঙ্গের অগ্রভাগের **প্রিপিউস** (prepuce) নামক চামড়া কেটে ফেলা হলেও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এটির আবির্ভাব ঘটে।

৬. ব্যবহারের ফলে জীব ও তার অঙ্গ আকারে বৃদ্ধির পরিবর্তে অনেক সময় ছোট হতেও দেখা যায়।

৭. অভাববোধ ও প্রয়োজনের তাগিদে অঙ্গ সৃষ্টির ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। আকাশে উড়বার আকাঙ্ক্ষায় কোন মানুষের মনে পাখির মতো ডানার জন্য অভাব বোধ জাগলেও মানুষের দেহে কখনো ডানা গজাবে না।

জিনতত্ত্বের দ্রুত অগ্রগতির ফলে কিভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় এবং কিভাবে জীবদেহে পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে বর্তমানে ধারণা স্পষ্ট। ল্যামার্কের মতবাদ অনুসারে ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলে অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেহকোষের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়। বিবর্তনতত্ত্বে প্রথম পথপ্রদর্শক হলেও ল্যামার্কের এ ধারণা সত্য নয়। বর্তমানে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বংশগতির ধারায় দেহকোষের কোনো ভূমিকা নেই। কেবল মাত্র **যে সকল পরিবর্তন জননকোষের পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্টি হয় সে সকল পরিবর্তনজনিত অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়।**

উপসংহার : ল্যামার্কের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক এবং গ্রহণযোগ্য না হলেও ল্যামার্কই প্রথম নতুন প্রজাতির উৎপত্তিতে পরিবেশ ও বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করেন এবং তিনিই বিবর্তনবাদের প্রথম পথপ্রদর্শক।

CamScanner

ডারউইনিজম বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ
(Darwinism or Theory of Natural Selection)

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (naturalist) ছিলেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত "Origin of Species By Means of Natural Selection" নামক গ্রন্থে তিনি অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও জোরালো মতবাদ প্রকাশ করেন। এ মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম** নামে পরিচিত। এ মতবাদের মাধ্যমে তিনি অভিব্যক্তির কলাকৌশল ও প্রবাহ সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাবলী প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি উদ্ভিদ, প্রবাল, মানুষের উদ্ভব, আগ্নেয়গিরির ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণমূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

আধুনিক চিন্তা জগতের অন্যতম মহাস্থপতি ছিলেন **চার্লস রবার্ট ডারউইন** (Charles Robert Darwin)। তিনিই সর্বপ্রথম আপন অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে বিবর্তনের ঘটনাবলিকে যুক্তিনিষ্ঠ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন।

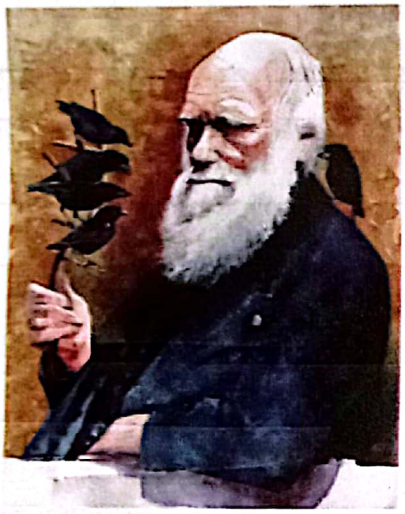

Charles Robert Darwin

H.M.S. Beagle

১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর **এইচ. এম. এস. বিগল** (Her Majestic Service Beagle) নৌজাহাজের একজন অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ হিসেবে **দক্ষিণ আটলান্টিক** এবং **প্রশান্ত মহাসাগর** জরীপদলের সাথে ইংল্যান্ডের **ডেভেনপোর্ট** (Devenport) থেকে যাত্রা শুরু করেন।

প্যাটাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট জাগে দ্বীপ, ব্রাজিল, তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড হয়ে ভারত মহাসাগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর (১৮৩১-১৮৩৬) পর বিগল ইংল্যান্ডে ফিরে আসে। এ সমুদ্র ভ্রমণে ডারউইন অসংখ্য জীবাশ্ম, খনিজ পদার্থ ও পাথর সংগ্রহ করেন।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কয়েক খন্ড বই রচনা করেন। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি প্রজাতি উৎপত্তির সমস্যা-ঘটিত হাজারো প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রজাতি উদ্ভবের খসড়া রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ও প্রমাণাদিসহ ১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" শিরোনামে ডারউইনের বিশ্ব কাঁপানো, যুগান্ত সৃষ্টিকারী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

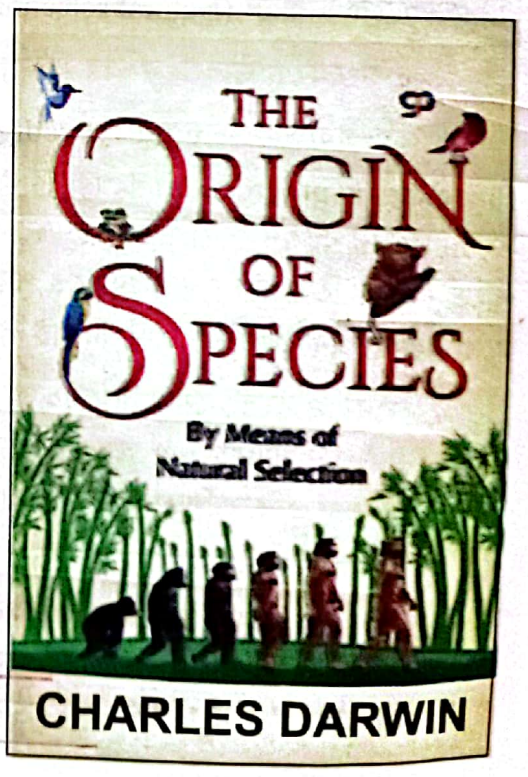

CamScanner

সমসাময়িককালে আরেকজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস**(Alfred Russel Wallace) জীবের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেন। তাই ডারউইনবাদ **"ডারউইন-ওয়ালেস"** মতবাদ নামেও পরিচিত।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে ডারউইন মারা যান। ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন-এর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ডারউইনবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে **ডারউইন** ও **ওয়ালেস** (Wallace) জৈব বিবর্তন সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাই পরবর্তীতে **ডারউইনবাদ** নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ মতবাদের ভিত্তি দুটি; যথা– (১) জীবজগতের কতগুলো বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং (২) এ বাস্তব ঘটনাবলীর ফলাফল প্রকাশ। ভিত্তিমূলদুটির উপর প্রতিষ্ঠিত ডারউইনবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ৬টি ধাপে ভাগ করেছে। প্রত্যেক জীব ঐ ধাপগুলো অতিক্রম করেই একেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। সর্বশেষ ধাপটির বক্তব্য অনুযায়ী ডারউইনবাদকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** বলা হয়, কারণ **প্রজাতি উদ্ভবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকৃতিই নির্বাচন করে থাকে কারা টিকে থাকতে সমর্থ বা অসমর্থ।**

নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে প্রয়োগযোগ্য ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ কয়েকটি পৃথক ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পারস্পরিক সম্পর্কের সার্থক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। নিচের ছকে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরা হলো।

ঘটনা প্রবাহ	সিদ্ধান্ত
১. বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of production) ২. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food and space)	জীবন সংগ্রাম
৩. জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) ৪. পরিবৃত্তির অসীম ক্ষমতা (Omnipotence of variation amongst the individual)	যোগ্যতমের জয়
৫. যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) ৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)	নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

নিচে সংক্ষেপে ডারউইন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হলো–

১. **বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of Production)** : প্রাণী–উদ্ভিদ নির্বিশেষে **জ্যামিতিক হারে** (geometrical progression) বংশবৃদ্ধির প্রবণতা দেখায়। ফলে বাঁচার সম্ভাবনা সম্পন্ন জীবের সংখ্যার চেয়ে জন্ম নেয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় বহুগুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ-একটি **স্যামন মাছ** (Salmon fish) এক ঋতুতেই দু'কোটি আশি লক্ষ ডিম পাড়ে। সমস্ত ডিম যদি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় এবং অনুরূপভাবে ডিম পাড়ে তবে, পৃথিবীর জলভাগ কয়েক বছরের মধ্যে কেবল এক প্রজাতির প্রাণী দিয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।

২. **খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Food & Space) :** প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন হার এবং ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমিত। এ অবস্থায় জীবের জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির ফলে এদের ভিতর পর্যাপ্ত আহার ও যোগ্য বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থাৎ এরা প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হবে।

৩. **জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence) :** ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক বাধা কার্যকর হয় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে। একদিকে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি অন্যদিকে পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়। এতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত জীব বাছাই হয়ে যায়। এটিই **জীবন সংগ্রাম** বা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। জীবন সংগ্রাম প্রধানত নিচে বর্ণিত তিনভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

CamScanner

ক. **অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Intra-Specific Struggle) :** একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকম হওয়ায় এদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একেই **অন্তঃপ্রজাতিক** বা **স্বপ্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলা হয়। যেমন– বট গাছের নিচে লক্ষ লক্ষ বীজ পতিত হলেও এ গাছের নিচে সাধারণত বটের চারা দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা এত বিপুল সংখ্যক বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান গাছ তলায় অল্প জায়গায় থাকেনা। বরং কিছু সংখ্যক বীজ পাখি ও অন্য মাধ্যমে বাহিত হয়ে কোনো ফাঁকা জায়গায় পতিত হলে সেখানে চারা গজায় ও পরিণতি লাভ করে। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি দ্বীপে নির্দিষ্ট প্রজাতির তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে গেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত হওয়ায় এরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সবল প্রাণিগুলো দুর্বল প্রাণিদের প্রতিহত করে, ফলে দুর্বল প্রাণিগুলো কিছু দিনের মধ্যেই অনাহারে মারা যায়।

খ. **আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Inter-Specific Struggle) :** যে কোন দুটি বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে বাঁচার জন্য যে প্রতিযোগিতা ঘটে তাকেই **আন্তঃপ্রজাতিক** বা **বিষম প্রজাতির সঙ্গে সংগ্রাম** বলা হয়। যেমন- ব্যাঙ একদিকে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে, অন্যদিকে ব্যাঙ সাপ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার ময়ুর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ উভয়েই ভক্ষিত হয়। এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে **খাদ্য-খাদক** সম্পর্কযুক্ত এক নিখুঁত বাস্তব জীবন সংগ্রাম গড়ে উঠে।

গ. **পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental Struggle) :** জীব যে পরিবেশে বাস করে এবং সেখানে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তা থেকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয় তাকে **পরিবেশগত সংগ্রাম** বলে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, অধিক তাপ ও শৈত্য, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় জীবকূলের ব্যাপক ক্ষতি করে। বরফ যুগের কবলে পড়ে **ম্যামথ** (mammoth) সহ অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য বজায় রাখতে এ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

৪. সার্বজনীন পরিবৃত্তি বা প্রকরণের উপস্থিতি (Universal Occurrence of Variations) : বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে কোন দুটি জীবই হুবহু একরকম নয়। এমনকি একই পিতামাতার সন্তানাদির মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও তারা কখনই হুবহু এক রকম নয়, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। আর এই পার্থক্যগুলোই **পরিবৃত্তি** বা **প্রকরণ** নামে পরিচিত। ডারউইন মনে করতেন যে, জীবন সংগ্রামের ফলে জীবদেহে যে পরিবৃত্তি ঘটে তা বংশগতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পরিবৃত্তি দুধরনের : যথা–**ধারাবাহিক পরিবৃত্তি** এবং **অধারাবাহিক পরিবৃত্তি**। ধারাবাহিক পরিবৃত্তিতে জীবের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজিত হয়ে ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টির লক্ষে এগিয়ে যায়। ডারউইন তাই পরিবৃত্তিকে বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করেন। অধারাবাহিক পরিবৃত্তি আকস্মিক, অনিয়মিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। কাজেই, প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাপারে এ ধরনের পরিবৃত্তির তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

৫. যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest) : জীবন সংগ্রামে যে জীব যোগ্য ও অনুকূল প্রকরণ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে শুধু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। পক্ষান্তরে জীবন সংগ্রামে যে অযোগ্য সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই দেখা যায় যে, অনুকূল প্রকরণের ফলে জীব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হলে সে জীব জীবন সংগ্রামে টিকে যায়। যেসব জীবে সুবিধাজনক/অনুকূল প্রকরণ ঘটে না সেগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে।

৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) : যে সব জীবের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি আছে প্রকৃতি তাদের নির্বাচন ও লালন করে। সুবিধাজনক পরিবৃত্তিধারী জীব পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। এদের বংশধরের মধ্যে পরিবৃত্তিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবাহিত হয়। যাদের সুবিধাজনক পরিবৃত্তি বেশি থাকে প্রকৃতি পুনরায় তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগ ধরে প্রকৃতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

CamScanner

ডারউইনবাদ-এর সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান। বিশ্বব্যাপী সমর্থিত হলেও মতবাদটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। কারণ এ মতবাদে যেমন কতকগুলো যৌক্তিক ও প্রশংসনীয় দিক আছে তেমন কতকগুলো অযৌক্তিক দিকও রয়েছে। নিচে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যৌক্তিক দিক বা সফলতা

১. ডারউইনবাদের মূল বক্তব্যগুলো (যেমন–বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি) অনেকাংশেই বাস্তব।
২. বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ডারউইনবাদের সমর্থক।
৩. অতীতের অনেক বিশালদেহী জীব জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
৪. অভিযোজনে ব্যর্থ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ডারউইনবাদকে সমর্থন যোগায়।
৫. প্রকৃতিতে একই প্রজাতির দুটি জীব হুবহু একরূপ নয়। এটিই প্রকৃতিতে প্রকরণের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

অযৌক্তিক দিক বা দুর্বলতা

১. জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা বলা হলেও, কিভাবে উপযুক্ত প্রকরণের উদ্ভব হয় সেকথা বলা হয়নি।
২. জীবজগতের সব নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন নয়।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।
৪. ডারউইন যে কোন ধরনের প্রকরণ বা পরিবৃত্তিকে বংশগত বলে মনে করতেন। কিন্তু আমরা জানি কেবল জননকোষে সংঘটিত প্রকরণগুলোই বংশানুসরণযোগ্য।
৫. একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম।

নব্য-ডারউইনবাদ বা নিও-ডারউইনিজম (Neo-Darwinism)

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেড়শ বছরের বেশি অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জীববিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মিলেছে। বিশেষ করে বিগত শতাব্দীতে জিন, ক্রোমোজোম ও মিউটেশন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক পর্যায়ে **ভাইজম্যান** (August Weismann) ও তাঁর অনুগামীরা ডারউইনের মতবাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে নতুন জ্ঞানের আলোকে সবল করে তোলেন। ভাইজম্যান ও তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের এ নবমূল্যায়নকে **নব্য-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

ভাইজম্যানের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে জীবদেহে পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বাহ্য প্রভাব বংশানুসৃত হয় না। তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইঁদুর ছানার লেজ কেটে কোনো প্রজন্মে ছানার লেজের দৈর্ঘ্য কমতে দেখেননি। ১৮৯৬ সালে তিনি **তাঁর জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম** (Germplasm-Somatoplasm) তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে জীবের জননাঙ্গে অবস্থিত জননকোষে থাকে জার্মপ্লাজম, আর দেহের অবশিষ্ট কোষে (somatic cell) থাকে **সোমাটোপ্লাজম**। পরিবেশের প্রভাবে সোমাটোপ্লাজমে পরিবর্তন ঘটলেও জার্মপ্লাজমে কোন পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। তাই কেবল সোমাটোপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তন বংশগতি লাভে সমর্থ হয় না। সুতরাং পরিবেশের সব প্রত্যক্ষ প্রভাবই বিবর্তনের শর্ত হতে পারে না।

নব্য-ডারউইনবাদীদের মধ্যে ভাইজম্যান ছাড়া **হাক্সলি** (T.H. Huxley), **স্পেনসার** (H. Spencer), **জর্ডান** (B.S. Jordan), **গ্রে** (Asa Gray) এবং **হেকেল** (E. Haeckel) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নব্য-ডারউইনবাদ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে–

১. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে পপুলেশন পর্যায়ে।
২. অভিযোজনের কারণ একাধিক, প্রাকৃতিক নির্বাচন এগুলোর মধ্যে একটি।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে জীবের জার্মপ্লাজম স্তরে। আর জার্মপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তনই বংশগতি লাভে সমর্থ হয়।
৪. জার্মপ্লাজম তত্ত্বের আলোকে কেবল গোনাড থেকে জননকোষে জেনেটিক বস্তু গঠিত হয়।
৫. এ মতবাদে প্রকরণের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে জননকোষে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরবর্তি বংশধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে, এর ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

CamScanner

ল্যামার্ক ও ডারউইন-এর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	ল্যামার্কবাদ (Lamarckism)	ডারউইনবাদ (Darwinism)
১. মতবাদের নাম	অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ।	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ।
২. প্রবর্তনকাল	১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ।	১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
৩. যে গ্রন্থে প্রকাশিত	Philosophic Zoologique	Origin of Species by Means of Natural Selection
৪. মূল প্রতিপাদ্য	অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার প্রভৃতি।	বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা, জীবন সংগ্রাম, প্রকরণ, যোগ্যতমের জয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি প্রভৃতি।
৫. বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ	প্রচেষ্টা, ব্যবহার ও অব্যবহার।	প্রকরণ।
৬. গ্রহণযোগ্যতা	কম (অনাদৃত ও পরিত্যক্ত)।	অধিক (সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য)।

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ (Evidences in favour of Organic Evolution)

বিবর্তনের উপর আজ পর্যন্ত যেসব মতবাদ এবং তথ্যাদি উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে, বিবর্তন নিছক একটি কল্পনা নয়। এটি একটি সচল প্রক্রিয়া, যা মন্থর গতিতে হলেও প্রকৃতিতে সব সময়ই ঘটে চলেছে। বিবর্তনের স্বপক্ষে ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীরা অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যদিও এসবের কলাকৌশলের উপর কিছু মতভেদ আছে। যেসব প্রমাণ বহুল আলোচিত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Evidence from Morphology)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন ও আকৃতি (বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ) সম্বন্ধে আলোচিত হয় তাকে অঙ্গসংস্থান (morphology) বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাহ্যিক ও অন্তর্গঠন পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট মনে হবে নিম্নশ্রেণির প্রাণী থেকে উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে অঙ্গসংস্থানজনিত জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবর্তনের স্বপক্ষে অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়।

ক. তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy)

বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণিদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হলেও তাদের নানা অঙ্গের গঠন কাঠামোর মধ্যে সমতা পরিলক্ষিত হয়।

❐ **মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠ :** বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাছের হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট-১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল, উভচরের হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট–২টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল, সরিসৃপের হৃৎপিণ্ডে ২টি অ্যাট্রিয়াম এবং অসম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত ২টি ভেন্ট্রিকল থাকে। পাখি ও স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ড ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট–২টি অ্যাট্রিয়াম ও ২টি ভেন্ট্রিকল। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের হৃৎপিণ্ডের এ তুলনা থেকে বুঝা যায় যে, বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে বিবর্তনের ধারায় মাছের ২ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড উভচরের ক্ষেত্রে ৩ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছে।

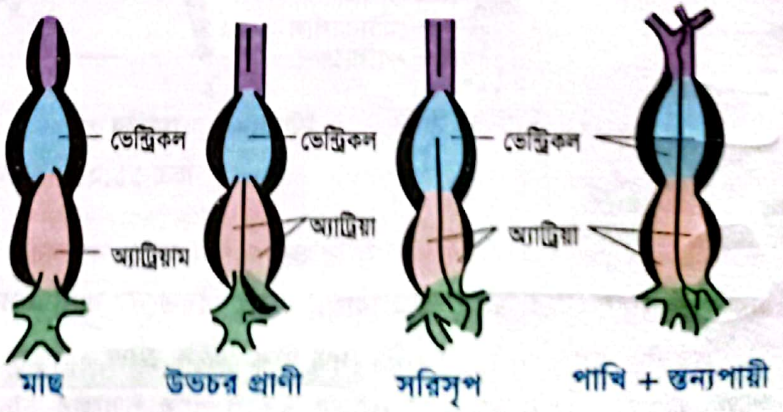

চিত্র ১১.২.৪ : বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

❐ **মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক :** বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাছ থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। বিবর্তনের সোপানে যতই উপর দিকে উঠা যায়, ততই অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের মূল কাঠামোটির ক্রমিক জটিলতা দেখা যায়, বিশেষ করে **সেরেব্রাম** (cerebrum) এবং **সেরেবেলাম** (cerebellum)-এর।

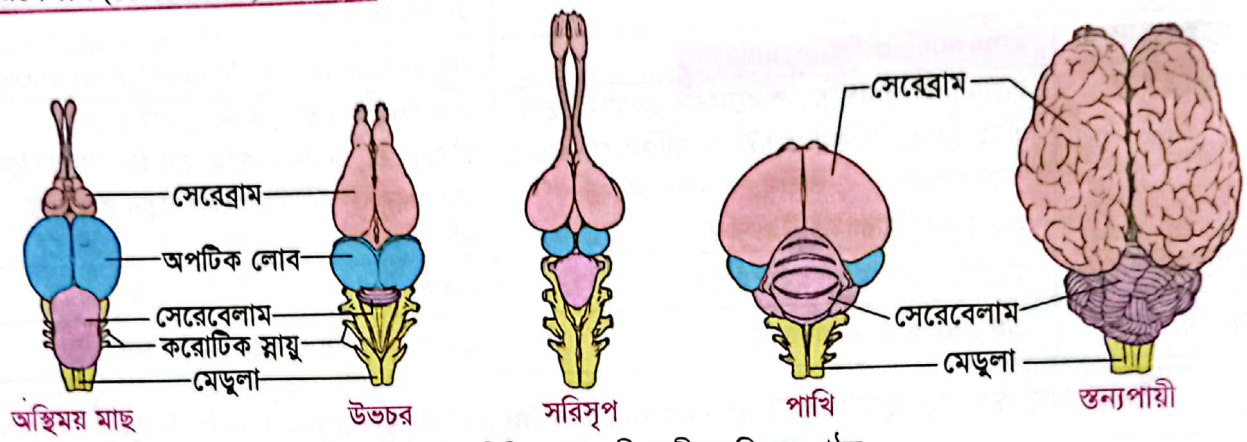

চিত্র ১১.২.৭ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন

খ. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ (Homologous Organs and Analogous Organs)

সমসংস্থ অঙ্গ : যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তি এক সেসব অঙ্গকে সমসংস্থ অঙ্গ বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদ, যেমন-পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমি বা সীল-এর ফ্লিপার (দাঁড়ের মতো হাত), ঘোড়া বা বিড়ালের অগ্রপদ, মানুষের হাত সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ। এসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠন একই রকম। বাহ্যিক বিভিন্নতার জন্য আপাতদৃষ্টিতে এসব অঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হলেও অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে বলা যায়, এগুলো মূলত **পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট** (pentadactyle) **অগ্রপদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ**। অগ্রপদে যেসব অস্থি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে সেগুলো হচ্ছে **হিউমেরাস, রেডিয়াস ও আলনা, কার্পাল, মেটাকার্পাল ও ফ্যালাঞ্জেস**।

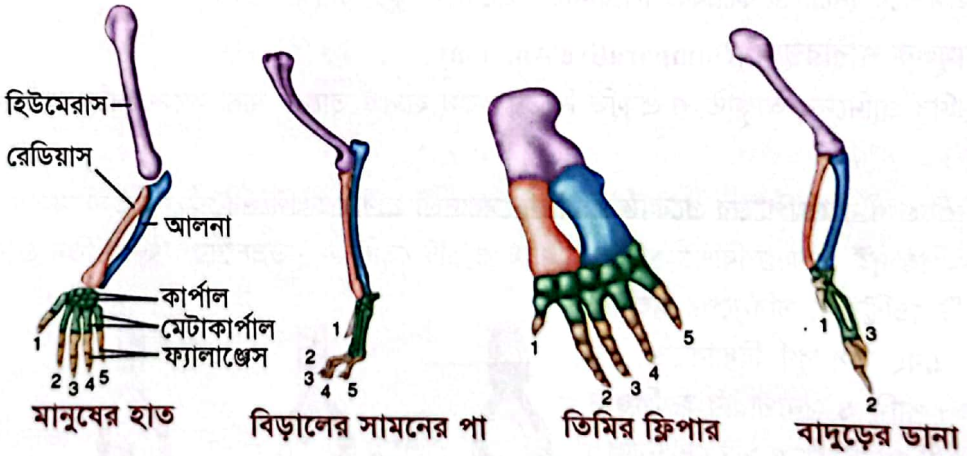

চিত্র ১১.২.৮ : সমসংস্থ অঙ্গসমূহ

সমসংস্থ অঙ্গগুলো নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। অতএব বলা যায়, এসব প্রাণিগোষ্ঠি একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং বিভিন্ন ধারায় বিবর্তনের জন্য এসব অঙ্গের মধ্যে আপাত পার্থক্য দেখা যায়।

সমবৃত্তি অঙ্গ : যেসব অঙ্গ গঠনগত দিক থেকে আলাদা কিন্তু কাজের দিক থেকে এক সেগুলোকে সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন- পাখির ডানা, প্রজাপতির ডানা। পাখি পতঙ্গের ডানা নিরীক্ষায় দেখা যায়, এরা ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, ডানার কাজও এক কিন্তু এদের গঠন ও পরিস্ফুটনে কোনো মিল নেই। অতএব, এক্ষেত্রে সমবৃত্তি অঙ্গের বাহকদের মধ্যে জ্ঞাতিতাত্ত্বিক কোনো সম্পর্ক নেই।

CamScanner

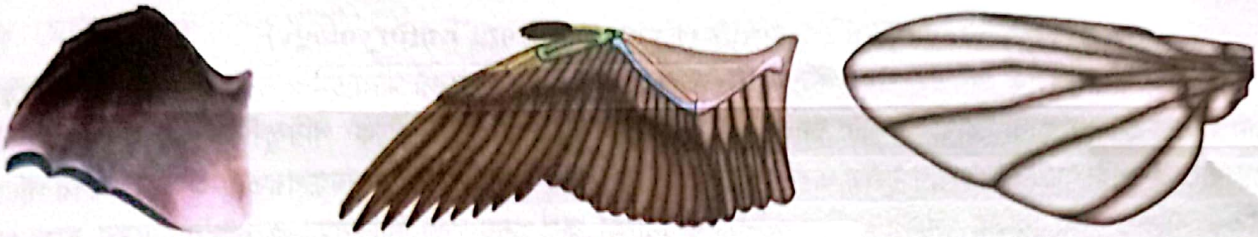

বাদুরের ডানা | পাখির ডানা | পতঙ্গের ডানা

চিত্র ১১.২.৯ : সমবৃত্তি অঙ্গসমূহ

গ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ (Vestigeal organs)

যেসব অঙ্গ একসময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু পরবর্তী পুরুষের দেহে গুরুত্বহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে, তাদেরকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। এসব অঙ্গ বিবর্তনের সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ অন্য প্রাণিদের সদৃশ অঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্রাকার বা অগঠিত। প্রাণিজগতে এ ধরনের নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সংখ্যা অগণিত।

মানবদেহে প্রায় শতাধিক নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিচে এদের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. **লোম :** মানুষের গায়ের লোম একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। কখনও কখনও হঠাৎ করে লোমশ শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে মানুষ এখনও তার পূর্বপুরুষের এ বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে।

২. **উপপল্লব (Nictitating membrane) :** এটি চোখের ভিতরের দিকের কোণায় ত্বকের একটি ক্ষুদ্রাকার নিষ্ক্রিয় ভাঁজ হিসেবে অবস্থান করে। কিন্তু ব্যাঙ, পাখি প্রভৃতি প্রাণীতে এটি তৃতীয় চোখের পাতারূপে সুগঠিত ও কার্যকরী থাকে।

৩. **আক্কেল দাঁত :** মানুষের আক্কেল দাঁত অন্যান্য দাঁতের সাথে উঠেনা। অনেক পরে এ দাঁত গজায় কিন্তু কার্যকরী না হওয়ায় এটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গরূপে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি গজায়ও না।

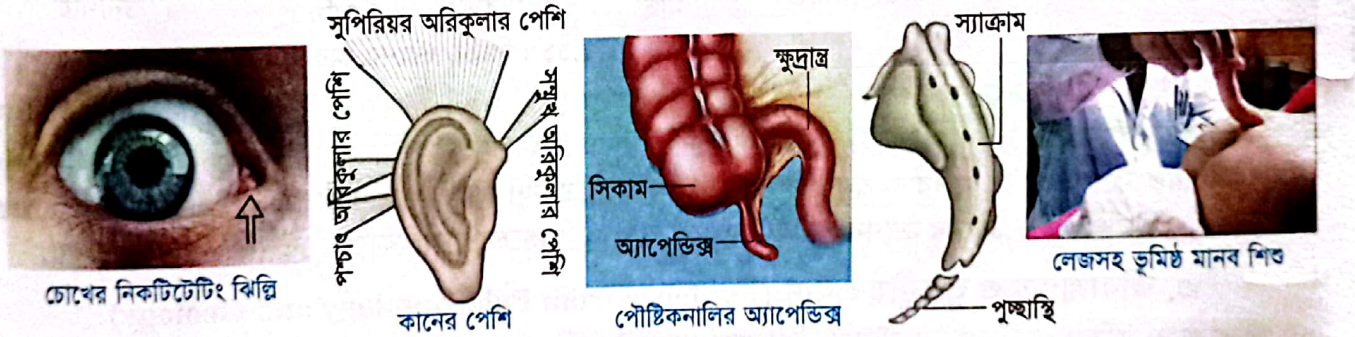

চোখের নিকটিটেটিং ঝিল্লি | কানের পেশি | পৌষ্টিকনালির অ্যাপেন্ডিক্স | লেজসহ ভূমিষ্ঠ মানব শিশু

চিত্র ১১.২.১০ : মানবদেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ

৪. **কানের পেশি :** মানুষের বহিঃকর্ণের পাশে তিনটি করে নিষ্ক্রিয় পেশি থাকে। কিন্তু এ পেশিগুলো অন্যান্য স্তন্যপায়ীতে সুগঠিত ও কার্যকরী। পেশিগুলোর সাহায্যে ঐসব প্রাণী শব্দ তরঙ্গকে ধরার জন্য কান নাড়াতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের এ পেশিগুলোও সুগঠিত হতে পারে।

৫. **পুচ্ছাস্থি বা কক্সিক্স (Coccyx) :** বানর, শিম্পাঞ্জি, গরু প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণিদের লেজ আছে। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী মানুষের কোনো লেজ নেই, তবে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে কক্সিক্স নামক লেজের অনুরূপ লুপ্তপ্রায় একটি অঙ্গ আছে। অনেক সময় লেজসহ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হতে দেখা যায়।

৬. **অ্যাপেনডিক্স (Appendix) :** কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বৃহদন্ত্রের সাথে যুক্ত আঙুলের মতো একটি অ্যাপেনডিক্স থাকে। গিনিপিগ, খরগোশ ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীতে অ্যাপেনডিক্স সুগঠিত ও কার্যকর। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এটি বিলুপ্তপ্রায় ও অকার্যকর।

জৈব বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ এসব অঙ্গকে উপস্থিত করে বলা যায় যে, বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত প্রজাতির দেহ থেকে ঐ অঙ্গ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় নাই, তাই এরা অগঠিত ও অকার্যকর থেকে প্রাণিটির পূর্বপুরুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

CamScanner

২. ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Embryology)

ভ্রূণতত্ত্ব, তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব এবং পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্ব জৈব বিবর্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে অনেকে মনে করেন। প্রতিটি বহুকোষী প্রাণী একটি জাইগোট (একটি একক কোষ) থেকে পরিস্ফুটিত হয়। মানুষসহ সকল বহুকোষীতেই জাইগোটের বিভাজন মূলত এক রকম। যে সব পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠনগত সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ তাদের পরিস্ফুটন পদ্ধতিও সদৃশ। পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিস্ফুটনরীতি বিভিন্ন রূপ নেয়। এ বিভিন্নতা অনেকটা গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মতো অগ্রসর হতে থাকে। মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণগুলোকে প্রথম অবস্থায় পরস্পর থেকে প্রায় পৃথকই করা যায় না। পরিস্ফুটনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রেণির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়।

ভ্রূণের এ সাদৃশ্য লক্ষ করে জার্মান বিজ্ঞানী **কার্ল ভন বেয়ার** (Karl von Baer, 1818) বলেছেন যে **ভ্রূণাবস্থায় একটি জীব তার আদি ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে থাকে**। তাঁর মতে – (i) বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবির্ভাবের আগে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব ঘটে; (ii) সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে অবশেষে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়; (iii) ভ্রূণাবস্থায় একটি প্রাণী তাড়াতাড়ি অন্যান্য প্রাণীর গঠন ত্যাগ করে; এবং (iv) একটি শিশু প্রাণীকে তার নিম্নস্তরের প্রাণিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দশার মতো নয় বরং শিশু বা ভ্রূণীয় দশার মতো দেখায়। অতএব বলা যায় যে, **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়ে পরে বিভিন্নভাবে বিকশিত ও অভিযোজিত হয়েছে**।

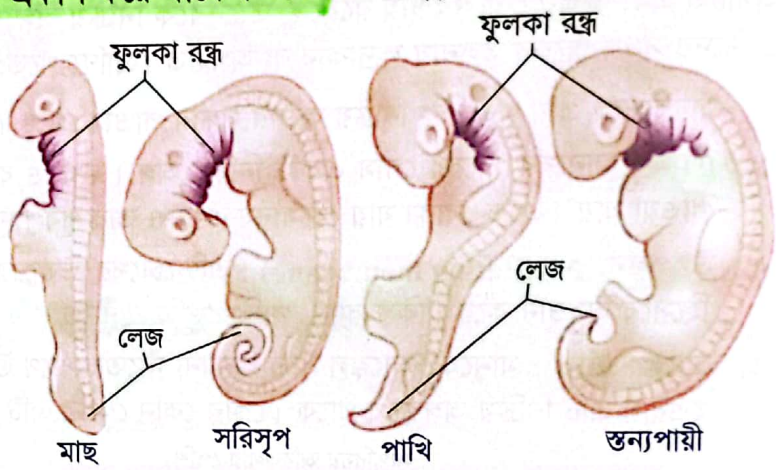

চিত্র ১১.২.১১ : বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণের সাদৃশ্য

পরবর্তীকালে **আর্নেস্ট হেকেল** (Ernest Haeckel-1834-1919) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রাণীর জীবন-ইতিহাস এবং ভ্রূণের পরিস্ফুটন পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে **পুনরাবৃত্তি মতবাদ** (Recapitulation Theory) নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী, **ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি করে** (Ontogeny Recapitulates Phylogeny); অর্থাৎ একটি জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালে তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলি পুনরাবৃত্ত হয়।

৩. জীবাশ্মগত ও ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ (Evidence from Palaeontology and Geology)

জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) : ল্যাটিন *fossilis* শব্দ থেকে ইংরেজি fossil শব্দের উৎপত্তি। *Fossilis* শব্দের অর্থ হলো dug-out বা খুড়ে তোলা। আগে মাটি খুড়ে যা কিছু তোলা হতো তাকেই **জীবাশ্ম বা ফসিল** বলা হতো। বর্তমানে, পৃথিবীর ভূত্বকে (crust) **প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক জীবের দেহ, দেহাবশেষ বা দেহের কোন অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে**। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম আহরণ, বয়স ও বিবর্তনের ধরন নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় তাকে **প্যালিওন্টোলজী** (Palaeontology) বা **জীবাশ্মবিদ্যা** বলে।

বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য (উপাদান) হচ্ছে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তর সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হয় বলে বিবর্তনের এ প্রমাণকে **ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ** (geological evidence)-ও বলা হয়।

ভূত্বকের পাললিক শিলা গ্রানাইট পাথরের ভিত্তির ওপর স্তরিভূত সজ্জিত থাকে। ভূতত্ত্ববিদগণ এই পাললিক শিলাকে ৫টি প্রধান স্তরে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেক স্তর সৃষ্টিতে যতো সময় লেগেছে তাকে এরা (Era), প্রতিটি এরাকে একাধিক পিরিয়ড (period), প্রতিটি পিরিয়ডকে আবার ইপোক (Epoch)-এ ভাগ করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম লেড পদ্ধতি ও তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতির মাধ্যমে ভূত্বকের শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন স্তরে পাওয়া একই প্রাণীর জীবাশ্মগুলো যদি বয়স অনুযায়ী সাজানো যায় তাহলে সময়ের সঙ্গে ঐ প্রাণিগুলোর বিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে। বিভিন্ন শিলাস্তরে পাওয়া ঘোড়া, হাতি, উট ইত্যাদি প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে।

CamScanner

ক. ঘোড়ার বিবর্তনের ধারা

হাজার হাজার হাড় ও দাঁতের জীবাশ্ম থেকে ঘোড়ার বিবর্তনের যে কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক এবং নিঃসন্দেহে সেই একই বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে যে "পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে হয়।" নিচে ঘোড়ার বিবর্তনের প্রধান ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. *Eohippus* (ইওহিপ্পাস) : ইওসিন ইপোকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি বছর আগের *Eohippus* নামক ১১ ইঞ্চি উঁচু আকৃতির প্রাণীটিকে ঘোড়ার পূর্ব পুরুষ হিসেবে ধরা হয়। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণীর উত্তরসূরী, কিন্তু এর সামনের পায়ে ছিল ৪টি এবং পিছনের পায়ে ৩টি আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলো ছিল ক্ষুরাকার ও নখরযুক্ত।

২. *Orohippus* (অরোহিপ্পাস) : ঘোড়ার এই পুরুষের পা ৫ম আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশ বর্জিত, সামনের পায়ের মধ্য আঙ্গুলের বৃদ্ধি এবং পাশের আঙ্গুলের খর্বাকায় ধারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিও ইওসিন ইপোকের সদস্য।

৩. *Mesohippus* (মেজোহিপ্পাস) : ওলিগোসিন ইপোকে (সাড়ে ৪ কোটি বছর আগে)-এ ঘোড়ার উচ্চতা হয় ২৪ ইঞ্চি। প্রত্যেক পা ৩টি সক্রিয় আঙ্গুলবিশিষ্ট।

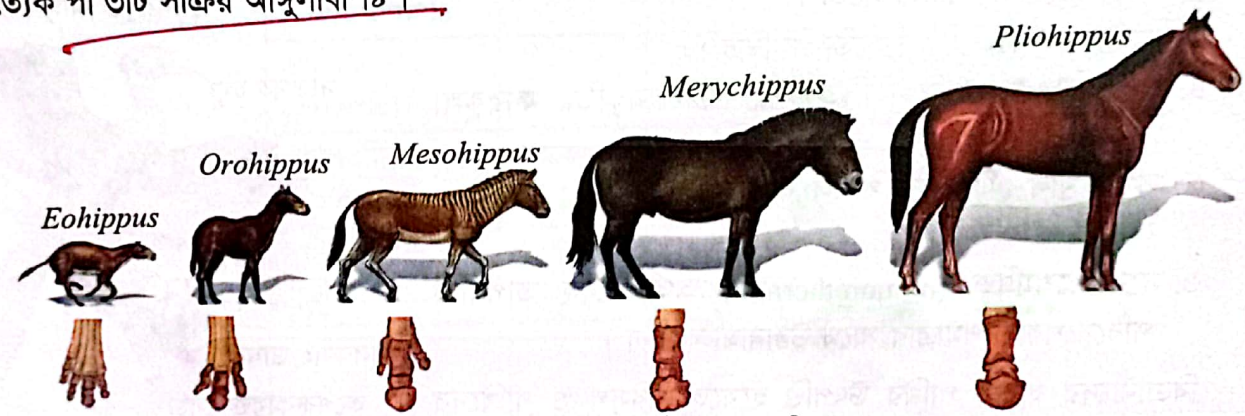

চিত্র ১১.২.১২ : ঘোড়ার বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ

৪. *Merychippus* (মেরিচিপ্পাস) : মায়োসিন ইপোকে (সাড়ে ৩ কোটি বছর আগে) ঘোড়া দৃশ্যত ৩ আঙ্গুলবিশিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি আঙ্গুলই কার্যক্ষম ছিল।

৫. *Pliohippus* (প্লিওহিপ্পাস) : প্লিওসিন ইপোকের (২ কোটি বছর আগে) ঘোড়ার পায়ে একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কোন আঙ্গুলের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এদের খুলি এবং দাঁতের বৈশিষ্ট্যও আধুনিক ঘোড়ার মতই ছিল।

৬. *Plesihippus* (প্লেসিহিপ্পাস) : *Pliohippus*-এর আরও একধাপ উন্নতি ঘটে এ জাতীয় ঘোড়ায় এবং এ থেকেই প্লিস্টোসিন ইপোকে (১০ লক্ষ বছর আগে) আধুনিক ঘোড়া *Equus* (ইকুয়াস)- এর উৎপত্তি হয়েছে।

ইওহিপ্পাস→অরোহিপ্পাস→মেজোহিপ্পাস→মেরিচিপ্পাস→প্লিওহিপ্পাস→প্লেসিহিপ্পাস→ইকুয়াস (আধুনিক ঘোড়া)।

খ. সংযোগকারী যোগসূত্র (Connecting Link)

দুটি কাছাকাছি শ্রেণিবদ্ধগত গোষ্ঠী যেমন– পর্ব বা শ্রেণির মধ্যবর্তী দশার জীবাশ্মকে **সংযোগকারী যোগসূত্র** বলে। *Archaeopteryx* (আর্কিওপটেরিক্স) এ ধরনের একটি জীবাশ্ম। আদি পাখির নাম **আর্কিওপটেরিক্স** (*Archaeopteryx lithographica* যার অর্থ ancient wing inscribed in stone)। এদের কোন সদস্য বর্তমানে জীবিত নেই। আজ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে **জুরাসিক যুগে** এর আবির্ভাব হয়েছিল। এই পাখির ধ্বংসাবশেষ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত **সোলেনহোপেন** অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০টি জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে সর্বশেষটি আবিষ্কৃত হয়েছে ২০০৭ সালে। *Archaeopteryx*-এর মধ্যে **সরিসৃপ ও পাখি** উভয় শ্রেণির কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির জন্য একে **সংযোগকারী যোগসূত্র** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

CamScanner

Archaeopteryx-এ সরিসৃপীয় বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরিসৃপের মতো লম্বা; বাহু শুষ্ক আঁইশ যুক্ত।
২. ২০টি কশেরুকাযুক্ত লম্বা লেজ।
৩. দেহকঙ্কাল পুরু ও নিরেট (বায়ু-পূর্ণ নয়) হাড় দিয়ে গঠিত।
৪. তীক্ষ্ণ ও ধারালো দু'সারি দাঁত; দাঁতগুলো চোয়ালের কোটরে বিদ্ধ।
৫. অগ্রপদে তিনটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল।
৬. মস্তিষ্কের গঠন সরল, সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নলাকৃতি।

চিত্র ১১.২.১৩ : *Archeopteryx*- এর জীবাশ্ম

Archaeopteryx-এ পাখির বৈশিষ্ট্য

১. ছোট-বড় ও উড্ডয়ন উপযোগী অসংখ্য পালক।
২. হাড়ের সংস্থাপন পাখির মতো।
৩. চোয়াল চঞ্চু (beak)-র মতো প্রলম্বিত।
৪. দুটি ক্ল্যাভিকল অস্থি মিলিত হয়ে "V" আকৃতির ফারকুলা (furcula) গঠন।
৫. মাথার খুলি ১টি অক্সিপিটাল কন্ডাইল (occipital condyle) যুক্ত।
৬. সমোষ্ণশোণিত (homoiothermic) অর্থাৎ দেহ তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করেনা।

চিত্র ১১.২.১৪ : জীবাশ্ম পুনর্গঠন করলে যেমনটা দেখাত

বিজ্ঞানীদের ধারণা পাখির উৎপত্তি হয়েছে সরিসৃপ ও পাখিদের মধ্যবর্তী প্রাণী *Archaeopteryx* থেকে। নিম্নতর সরিসৃপ প্রাণী থেকে উন্নত পাখিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে *Archaeopteryx* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। বিজ্ঞানী Huxley যথার্থই বলেছেন Birds are glorified reptiles অর্থাৎ পাখিরা হলো মহিমান্বিত সরিসৃপ।

পাখিদের বিবর্তনিক পথ হচ্ছে: সরিসৃপ→*Archaeopteryx*→ পাখি।

গ. জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil)

যে সব প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে আজও অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় প্রায় সবাই বহু আগে বিলুপ্ত হয়েছে এবং যারা পর্ব থেকে পর্বের বা শ্রেণি থেকে শ্রেণির উদ্ভবের নিদর্শন বহন করে চলেছে সেগুলোকে জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল বলে। *Platypus* (প্লাটিপাস) এ ধরনের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম। এর কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন–ডিম, রেচন-জননতন্ত্র) সরিসৃপ শ্রেণির মতো, আবার কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন-স্তনগ্রন্থি, লোম) স্তন্যপায়ীর মতো। এ ছাড়া *Limulus* (আর্থ্রোপোড) *Sphenodon* (সরিসৃপ), *Latimaria* (মাছ)-ও জীবন্ত জীবাশ্ম।

Limulus

Latimaria

Platypus

চিত্র ১১.২.১৫ : তিনটি জীবন্ত জীবাশ্ম

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)

এরা (Eras)	পিরিয়ড (Period)	ইপোক (Epoch)	বছর পূর্বে	প্রধান প্রাণী (Dominant Animals)	মন্তব্য (Remarks)
সিনোজয়িক (Cenozoic)		রিসেন্ট (Recent)	২৫ হাজার	আধুনিক মানুষ ও সভ্যতার উদ্ভব।	
	কোয়াটারনারি (Quaternary)	প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১০ লক্ষ	মানুষের প্রথম সামাজিক জীবন; বহু স্তন্যপায়ী লুপ্ত।	
	টারশিয়ারি (Tertiary)	প্লিওসিন (Pliocene)	২ কোটি	মানুষের উদ্ভব।	
		মায়োসিন (Miocene)	সাড়ে ৩ কোটি	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	সাড়ে ৪ কোটি	নানা ধরনের স্তন্যপায়ী।	স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammals)
		ইওসিন (Eocene)	সাড়ে ৬ কোটি	আদি স্তন্যপায়ী লুপ্ত; অমরায়ুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	সাড়ে ৭ কোটি	আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
মেসোজয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		সাড়ে ১৩ কোটি	ডাইনোসরের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, বর্তমান পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	
	জুরাসিক (Jurassic)		সাড়ে ১৬ কোটি	বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর; দাঁতযুক্ত প্রথম পাখি।	সরিসৃপের যুগ (Age of Reptiles)
	ট্রায়াসিক (Triassic)		সাড়ে ২২ কোটি	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী -সদৃশ সরিসৃপের প্রাধান্য।	
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	পারমিয়ান (Permian)		২৪ কোটি	বর্তমান পতঙ্গ; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; স্থলে প্রাণীর আবির্ভাব।	উভচরের যুগ (Age of Amphilia)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		২৯ কোটি	পতঙ্গ, কন্টকত্বক প্রাণী, হাঙ্গর, আদি সরিসৃপ।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		সাড়ে ৩৭ কোটি	বহু প্রজাতির মাছ; উভচরের আবির্ভাব।	মাছের যুগ (Age of Pisces)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		সাড়ে ৪২ কোটি	কাঁকড়া, বিছা, মাছ।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		সাড়ে ৫০ কোটি	প্রবাল; মাছের উদ্ভব।	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী (Marine Invertebrates)
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		সাড়ে ৫৮ কোটি	অমেরুদণ্ডী; ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি।	
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			২৫০ কোটি	আদ্যপ্রাণী।	
আরকিওজয়িক (Archeozoic)			৪০০ কোটি	কোন জীবাশ্ম নেই।	

CamScanner

৪. শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Evidence from Taxonomy)

সমগ্র জীবজগতকে প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো আবার পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গণ (Genus), প্রজাতি (Species) ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত। এ ভাগগুলো খেয়াল খুশীমত করা হয়নি। ভাগগুলো প্রকৃতই সম্পর্ক নির্ভর। একই রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণিদের একটি প্রজাতিভুক্ত করা হয়। একই ধরনের অনেক প্রজাতি মিলে একটি "গণ", কয়েকটি গণের সমষ্টি একটি "বর্গ", অনেক বর্গের সমষ্টি মিলে একটি "শ্রেণি" এবং কয়েকটি শ্রেণি মিলে "পর্ব" এবং কয়েকটি "পর্ব" একত্র করে প্রাণিদের ক্ষেত্রে "প্রাণিজগত" এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্র "উদ্ভিদজগত" সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারণা জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যসমূহের সমতার কারণ হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো একই পূর্বপুরুষ থেকে বংশাধিকার সূত্রে পাওয়া।

৫. শারীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়ন ঘটিত প্রমাণ (Evidence from Physiology and Biochemistry)

নিচুশ্রেণির প্রাণীর জৈবনিক প্রক্রিয়া উচ্চশ্রেণির প্রাণীর মত জটিল নয়। তথাপিও একই শ্রেণির প্রাণিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে একই ধরনের। এদের খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, রেচন, শ্বসন প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জীব রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের একই ধরনের কতকগুলো জৈবিক উপাদান রয়েছে। যেমন–আমিষ, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। এসব উপাদানের আণবিক গঠনগত মিলও লক্ষণীয়। আদিতম জীব থেকে জটিলতম জীবে এসব উপাদানের উপস্থিতিই বিতর্তনের প্রমাণ বহন করে।

৬. কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Cytology)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের মৌলিক গঠন ও বিভাজন পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আণবিক পর্যায়ে সজীব কোষ–অঙ্গাণুগুলো, যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম, লাইসোজোম, গলজি বস্তু, ক্রোমোজোম প্রভৃতির গঠন প্রায় সদৃশ। তাই বলা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

৭. জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Genetics)

বিভিন্ন জীবের মধ্যে সমতা ও বৈষম্যের কারণ যে জিনগত গড়ন (genetic consitution) তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। জিনগত এ বৈশিষ্ট্যই বিবর্তনের ভিত্তি এবং কীভাবে এটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তাও বিজ্ঞানীদের কাছে আর অজানা নয়। *Drosophila* (ড্রসোফিলা)-র বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোমগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদের পূর্বপুরুষ নির্ধারণ করা যায় এবং এ সত্যই প্রকাশিত হয় যে ওরা একই পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে।

৮. ভৌগোলিক বিস্তৃতিগত প্রমাণ (Evidence from Geographical Distribution)

প্রাণিদের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে প্রকৃতিবিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace 1823-1913) ১৮৭০ সালে পৃথিবীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। একটি অঞ্চলের জীবের সাথে অন্যটির সাদৃশ্য খুব কমই। জীবের এমন ভৌগোলিক বিস্তার অভিব্যক্তিরই ধারা নির্দেশ করে।

একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রাপ্ত মারসুপিয়াল (marsupial) স্তন্যপায়ীদের উপস্থিতি ও অতীত বিস্তারকে বিবর্তনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়া অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে এমন এক সময় আলাদা হয়ে গিয়েছিল যখন মারসুপিয়ালরা পৃথিবীর অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল এবং তখনও অমরাধর (placental) স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব ঘটেনি। সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় সম্ভবত গুটিকয়েক ধরনের আদি স্তন্যপায়ী বাস করত। মূল ভূখন্ডে তখন অমরাধর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবের ফলে আদি প্রাণীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অমরাধর প্রাণী অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারায় মারসুপিয়ালরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে পরিবেশের প্রতিটি অংশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান

বিবর্তনের সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিবর্তন কোনো কাল্পনিক বিষয় নয় ধীর গতিতে হলেও বিবর্তন প্রকৃতিতে সব সময় ক্রিয়াশীর বিবর্তনের ফলে কোনো জীবের সরল অবস্থা থেকে জটিলতার দিকে পর্যাক্রমে অতি মন্থর গতিতে ধারাবাহিকতভাবে পরিবর্তন ঘটে। হাজার হাজার বছর ধরে একটি প্রজাতির পরিবর্তন ও অভিযোজন এর মাধ্যমে যে পরিবর্তন গটে তার ফলেই উদ্ভব হয় নতুন একটি প্রজাতির। বর্তমান পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে আকৃতি, অঙ্গসংস্থান ও স্বভাবের যে বৈচিত্র্য তা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অনন্যমুখী প্রক্রিয়া বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, প্রজাতির ধাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান অনস্বীকার্য।

CamScanner

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. প্রকৃতিতে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোনো সরল জীব থেকে জটিলতর ও উন্নত জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে জৈব বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে।

২. বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই অঙ্গের বিভিন্ন আকার হয়। এ প্রকার অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (divergent adaptation) বলে। এর ফলে জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের যে বিবর্তন ঘটে, তাকে অপসারী বিবর্তন (divergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমসংস্থ অঙ্গ গঠিত হয়।

৩. উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে ভিন্ন অঙ্গ যখন একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য একই বাহ্যিক আকারযুক্ত হয়, তখন ঐ প্রকার অভিযোজনকে অভিসারী অভিযোজন (convergent adaptation) বলে। এরূপ অভিযোজনের জন্য সংঘটিত বিবর্তনকে অভিসারী বিবর্তন (convergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমবৃত্তি অঙ্গ গঠিত হয়।

৪. প্রকৃতিতে দুটি জীব কখনও হুবহু এক রকম হয় না। বিভিন্ন কারণে জিন ও ক্রোমোজোমের পুনর্বিন্যাসের ফলে একই প্রজাতিভুক্ত প্রতিটি জীবের মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, কোষীয় এবং আচরণগত যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা বিভেদ বলে।

৫. পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল প্রকার জীব ইতোপূর্বে বিদ্যমান সরল প্রকৃতির জীব থেকে দীর্ঘ ধারাবাহিক ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে–এ ধারাই জৈব বিবর্তনবাদ নামে পরিচিত। বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলো হলো– ল্যামার্কিজম, ডারউইনিজম এবং নব্য-ডারউইনবাদ।

৬. ল্যামার্কের বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদটি Inheritance of Acquired Characters বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যর বংশাণুক্রম নামে খ্যাত এবং বিখ্যাত Philosophica Zoologique গ্রন্থে ১৮০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. ডারউইনের বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদটি প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা Theory of Natural Selection নামে পরিচিত এবং বিখ্যাত On The Origin Of Species By Means of Natrural Selection গ্রন্থে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. H.M.S বিগল নামের জাহাজে চড়ে চার্লস ডারউইন প্রায় ৫ বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দীপপুঞ্জ, বিশেষ করে গ্যালাপ্যাগোজ দীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন এবং জরিপ কাজ চালান।

৯. প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে।

১০. আদি শিলাস্তরে প্রস্তরীভূত অথবা পাললিক শিলাস্তরে জীবদেহের ছাপ বা রাসায়নিক পদার্থে সৃষ্ট জীবের অনুরূপ কাঠামোকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে।

১১. যে সব প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে এখনো তাদের আদিম বৈশিষ্ট্যসহ বেঁচে আছে অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় সকলেরই বহু পূর্বে বিলুপ্তি ঘটেছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। এদের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। উদাহরণ– *Limulus, Latimaria, Peripatus, Sphenodon* ইত্যাদি।

১২. *Archeopteryx* আনুমানিক ১৪–১৫ কোটি বছর পূর্বের জীবাশ্ম পাখি। পাখির মতো পালক আবৃত দেহ ও ডানা থাকলেও অস্থিময় দীর্ঘ লেজ, চঞ্চুতে দাঁত এবং ডানায় নখরযুক্ত তিনটি অঙ্গুলি থাকায় এদের সরিসৃপ ও আধুনিক পাখির মধ্যে যোগসূত্রকারী প্রাণী বলে বিবেচনা করা হয়।

১৩. যেসব অঙ্গ উৎপত্তি ও অন্তর্গঠনের দিক থেকে এক হলেও, বাহ্যিক গঠন এবং কাজের ধরনের দিক থেকে আলাদা, তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে। যেমন– ব্যাঙের অগ্রপদ, গিরগিটির অগ্রপদ, তিমির অগ্রপদ বা ফ্লিপার, কুকুরের অগ্রপদ, মানুষের হাত, বাদুড় ও পাখির ডানা ইত্যাদি।

১৪. যেসব অঙ্গ কার্যগতভাবে একই ধরনের কিন্তু উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে পৃথক, তাদের সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন– পতঙ্গ, পাখি ও বাদুড়ের ডানা; মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছার হুল; মাছের পাখনা ও তিমির ফ্লিপার; অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি।

১৫. আর্নেস্ট হেকেল ১৮৬৬ সালে পুনরাবৃত্তি মতবাদ প্রকাশ করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী একটি জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালে তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

CamScanner